প্রথম অধ্যায়

অজামিলের উপাখ্যান

শ্রীমদ্ভাগবতে সর্গ, বিসর্গ আদি দশটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তৃতীয়, চতুর্থ এং পঞ্চম স্কন্ধে সর্গ, বিসর্গ এবং স্থান বর্ণনা করেছেন। এখন, ঊনিশটি অধ্যায় সমন্বিত ষষ্ঠ স্কন্ধে তিনি পোষণ সম্বন্ধে বর্ণনা করবেন।

এই অধ্যায়ে অজামিলের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। অজামিল ছিল মহাপাপী, কিন্তু চারজন বিষ্ণুদূত যখন যমদূতদের হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করতে আসেন, তখন তিনি তাঁর পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যান। তিনি যে কিভাবে তাঁর পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, তার পূর্ণ বর্ণনা এই অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। পাপকর্মের ফল ইহলোক এবং পরলোক উভয় লোকেই যন্ত্রণাদায়ক। আমাদের নিশ্চিতভাবে জেনে রাখা উচিত যে, জীবনের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ হচ্ছে পাপকর্ম। সকাম কর্মের মার্গে অবধারিতভাবে পাপ হয়, এবং তাই কর্মমার্গে নানা প্রকার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা রয়েছে। এই সমস্ত প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপ বিনষ্ট হলেও পাপের মূল অবিদ্যা বিনষ্ট হয় না। তার ফলে প্রায়শ্চিত্ত করার পরেও মানুষ আবার পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়। তাই পবিত্র হওয়ার জন্য প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট নয়। জ্ঞানমার্গে যথাযথভাবে বস্তুজ্ঞান হওয়ার ফলে পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তাই জ্ঞানমার্গে জ্ঞানই প্রায়শ্চিত্তরূপে বিবেচিত হয়। সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করার সময় তপশ্চর্যা, ব্রহ্মচর্য, শম, দম, দান, সত্য, যম, নিয়ম প্রভৃতির দ্বারা পাপবীজ ভস্মীভূত হয়। জ্ঞানের উন্মেষেও পাপবীজ বিনষ্ট হয়। কিন্তু এই উভয় পন্থাও, মানুষকে পাপকর্মের প্রবণতা থেকে মুক্ত করতে পারে না।

ভক্তিযোগের দ্বারাই কেবল সম্পূর্ণরূপে পাপকর্মের প্রবণতা থেকে মুক্ত হওয়া যায়, অন্য কোনও উপায়ে নয়। তাই বৈদিক শাস্ত্রে কর্ম এবং জ্ঞান থেকে ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয়েছে। ভক্তির পথই সকলের পক্ষে পরম মঙ্গলদায়ক। সকাম কর্ম এবং জ্ঞান স্বতন্ত্রভাবে মুক্তি প্রদান করতে পারে না। কিন্তু ভক্তি কর্ম এবং জ্ঞানের অপেক্ষা না করেই মুক্তি প্রদান করতে পারে। ভক্তি এতই বলবতী যে, কেউ যদি তাঁর মনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে নিবদ্ধ করেন, তা হলে স্বপ্নেও তাঁকে যমদূতদের দর্শন করতে হয় না।

ভগবদ্ভক্তির মহিমা প্রমাণ করার জন্য শ্রীল শুকদেব গোস্বামী অজামিলের উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন। অজামিল ছিলেন কান্যকুব্জের (বর্তমান কনৌজের) অধিবাসী। তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে বেদ অধ্যয়ন এবং বিধিনিষেধ পালনের মাধ্যমে সদাচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণে পরিণত হওয়ার শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রাক্তন কর্মফলে এক বেশ্যার প্রতি আসক্তিপূর্বক তিনি সদাচার ভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হয়েছিলেন। সেই বেশ্যার গর্ভে অজামিলের দশটি পুত্র হয়, এবং তার মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রটির নাম ছিল নারায়ণ। মৃত্যুর সময় যমদূতেরা যখন অজামিলকে নিতে আসে, তখন অজামিল ভয়ে উচ্চস্বরে তাঁর প্রিয়তম পুত্র নারায়ণকে ডাকতে থাকেন। তার ফলে তাঁর ভগবান নারায়ণের বা শ্রীবিষ্ণুর স্মৃতির উদয় হয়। যদিও তিনি পূর্ণরূপে অপরাধ মুক্ত হয়ে নারায়ণকে ডাকেননি, তবুও তিনি নাম উচ্চারণের সুফল লাভ করেছিলেন। নারায়ণের নাম উচ্চারণ করা মাত্রই সেখানে বিষ্ণুদূতেরা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তখন বিষ্ণুদূত এবং যমদূতদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়, এবং সেই আলোচনা শুনে অজামিল মুক্ত হয়েছিলেন। তিনি কর্মমার্গের নিকৃষ্টতা এবং ভগবদ্ভক্তির শ্রেষ্ঠতা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ

নিবৃত্তিমার্গঃ কথিত আদৌ ভগবতা যথা ।
ক্রমযোগোপলব্ধেন ব্রহ্মণা যদসংসৃতিঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-পরীক্ষিৎ উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **নিবৃত্তি-মার্গঃ**—মুক্তির পথ; **কথিতঃ**—বর্ণনা করেছেন; **আদৌ**—পূর্বে; **ভগবতা**—আপনার দ্বারা; **যথা**—যথাযথভাবে; **ক্রম**—ক্রমশ; **যোগ-উপলব্ধেন**—যোগের দ্বারা লব্ধ; **ব্রহ্মণা**—(ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হওয়ার পর) ব্রহ্মার সঙ্গে; **যৎ**—যেই মার্গের দ্বারা; **অসংসৃতিঃ**—সংসারচক্রের সমাপ্তি।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে প্রভু, হে শুকদেব গোস্বামী, আপনি পূর্বে (দ্বিতীয় স্কন্ধে) মুক্তির পথ (নিবৃত্তিমার্গ) বর্ণনা করেছেন। সেই পথ অনুসরণ করে অবশ্যই ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকে উন্নীত হওয়া যায়, এবং সেখান থেকে ব্রহ্মার সঙ্গে চিৎ-জগতে উন্নীত হওয়া যায়। এইভাবে জীবের জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি লাভ হয়।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎ যেহেতু বৈষ্ণব ছিলেন, তাই পঞ্চম স্কন্ধের শেষে বিভিন্ন প্রকার নরকের বর্ণনা শ্রবণ করার পর, বদ্ধ জীবদের কিভাবে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করে ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তান্বিত হয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে দ্বিতীয় স্কন্ধে বর্ণিত নিবৃত্তি-মার্গের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ সৌভাগ্যক্রমে তাঁর মৃত্যুর সময় শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন এবং সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে তাঁর কাছে মুক্তির পন্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। শুকদেব গোস্বামী তাঁর প্রশ্নের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর প্রশংসা করে বলেছিলেন—

বরীয়ানেষ তে প্রশ্নঃ কৃতো লোকহিতং নৃপ ।
আত্মবিৎসম্মতঃ পুংসাং শ্রোতব্যাদিষু যঃ পরঃ ॥

"হে রাজন্, আপনার প্রশ্ন যথার্থই মহিমান্বিত, কেননা তা সমস্ত মানুষের পরম হিতকর। এই বিষয়টি সমস্ত শ্রবণীয় বিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞ মুক্তকুল কর্তৃক অনুমোদিত।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ২/১/১)

জীব যে বদ্ধ অবস্থায় ভগবদ্ভক্তিরূপ মুক্তির পন্থা অবলম্বন না করে নানা প্রকার নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে, তা দেখে পরীক্ষিৎ মহারাজ অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন। এটিই হচ্ছে বৈষ্ণবের লক্ষণ। *বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ*—বৈষ্ণব হচ্ছেন কৃপার সমুদ্র। পরদুঃখে দুঃখী—তিনি অন্যের দুঃখ দর্শন করে দুঃখিত হন। তাই বদ্ধ জীবদের নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখে পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন পূর্ববর্ণিত মুক্তির পন্থা পুনরায় বর্ণনা করেন। এই সম্বন্ধে *অসংসৃতি* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *সংসৃতি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে সংসার-চক্র বা জন্ম-মৃত্যুর চক্র। *অসংসৃতি* শব্দটি তার ঠিক বিপরীত অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গ, যার ফলে জন্ম-মৃত্যুর চক্র নিরস্ত হয় এবং ধীরে ধীরে ব্রহ্মলোকে উন্নীত হওয়া যায়। শুদ্ধ ভক্ত না হওয়া পর্যন্ত উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। শুদ্ধ ভক্তই কেবল ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের ফলে সরাসরিভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যান (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি*)। তাই পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে বদ্ধ জীবদের মুক্তির পথ সম্বন্ধে শ্রবণ করতে অত্যন্ত আগ্রহী হয়েছিলেন।

আচার্যদের মতে, *ক্রমযোগোপলব্ধেন* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, প্রথমে কর্মযোগ, তারপর জ্ঞানযোগ এবং অবশেষে ভক্তিযোগের স্তরে উন্নীত হওয়ার ফলেই কেবল মুক্তি লাভ করা যায়। ভক্তিযোগের কিন্তু এমনই প্রভাব যে, তা কর্মযোগ এবং

জ্ঞানযোগের উপর নির্ভর করে না। ভক্তিযোগের প্রভাবে কর্মযোগরূপ সম্পদ-বিহীন পাপী অথবা জ্ঞানযোগের সম্পদবিহীন মূর্খও চিৎ-জগতে উন্নীত হতে পারে। *মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ। ভগবদ্গীতায়* (৮/৭) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করার ফলে চিৎ-জগতে ফিরে যাওয়া যায়। যোগীরা কিন্তু সরাসরিভাবে চিৎ-জগতে না গিয়ে, কখনও কখনও অন্য সমস্ত লোক দর্শন করতে চান এবং তাই ব্রহ্মলোকে উন্নীত হন, যে কথা এই শ্লোকে *ব্রহ্মণা* শব্দটির মাধ্যমে সূচীত হয়েছে। প্রলয়ের সময় ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকের অধিবাসীদের সঙ্গে সরাসরিভাবে চিৎ-জগতে ফিরে যান। সেই কথা *বেদে* এইভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে—

ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে ।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥

"ব্রহ্মলোকের অধিবাসীরা এতই উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত যে, প্রলয়ের সময় তাঁরা ব্রহ্মাসহ সরাসরিভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যান।"

শ্লোক ২

প্রবৃত্তিলক্ষণশ্চৈব ত্রৈগুণ্যবিষয়ো মুনে ।
যোঽসাবলীনপ্রকৃতের্গুণসর্গঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ২ ॥

প্রবৃত্তি—প্রবৃত্তির দ্বারা; **লক্ষণঃ**—লক্ষণযুক্ত; **চ**—এবং; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **ত্রৈগুণ্য**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণ; **বিষয়ঃ**—বিষয়; **মুনে**—হে মহর্ষে; **যঃ**—যা; **অসৌ**—তা; **অলীন-প্রকৃতেঃ**—যে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত নয় তার; **গুণ-সর্গঃ**—যাতে জড় দেহের সৃষ্টি হয়; **পুনঃ পুনঃ**—বার বার।

অনুবাদ

হে মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী, জীব যতক্ষণ পর্যন্ত জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত না হয়, ততক্ষণ তাকে সুখ-দুঃখ ভোগ করার জন্য বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করতে হয়, এবং সেই শরীর অনুসারে তার বিভিন্ন প্রকার প্রবৃত্তি হয়। এই প্রবৃত্তি অনুসরণ করে সে প্রবৃত্তিমার্গে ভ্রমণ করে এবং স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হয়, যে কথা পূর্বেই (তৃতীয় স্কন্ধে) বর্ণিত হয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/২৫) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্লেষণ করেছেন—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥

"দেবতাদের উপাসকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হবেন; যারা ভূত-প্রেত আদির উপাসক তারা ভূতলোকই লাভ করে; যারা পিতৃপুরুষদের উপাসক, তারা অনিত্য পিতৃলোক লাভ করে; এবং যাঁরা আমার উপাসনা করেন, তাঁরা আমাকেই লাভ করেন।" জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের প্রভাবে জীবদের বিভিন্ন প্রকার প্রবৃত্তি বা প্রবণতা হয়, এবং তার ফলে তারা বিভিন্ন প্রকার গতি প্রাপ্ত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত জীবের জড়াসক্তি থাকে, ততক্ষণ সে স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়। কিন্তু ভগবান ঘোষণা করেছেন, "যাঁরা আমার পূজা করেন, তাঁরা আমার কাছে ফিরে আসেন।" যদি কারও ভগবান এবং তাঁর ধাম সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকে, তা হলে সে উচ্চতর লোকে জড় সুখভোগের চেষ্টা করে, কিন্তু যখন কেউ বুঝতে পারেন যে, এই জড় জগতে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নেই, তখন তিনি ভগদ্ধামে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কেউ যখন সেই স্থিতি লাভ করেন, তখন আর তাঁকে এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না (*যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম*)। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্যলীলা* ১৯/১৫১) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

"জীব তার কর্ম অনুসারে সারা ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করছে। কখনও সে স্বর্গলোকে উন্নীত হয়, আবার কখনও সে নরকে অধঃপতিত হয়। এই প্রকার কোটি কোটি ভ্রাম্যমাণ জীবের মধ্যে কোন অতি ভাগ্যবান জীব শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সদ্গুরুর সঙ্গ লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগুরুদেব উভয়ের কৃপার ফলে, তিনি তখন ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হন।" সমস্ত জীব ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভ্রমণ করছে। কখনও তারা উচ্চলোকে উন্নীত হচ্ছে, আবার কখনও তারা নিম্নলোকে অধঃপতিত হচ্ছে। এটিই হচ্ছে ভবরোগ, যাকে বলা হয় *প্রবৃত্তিমার্গ*। কেউ যখন সদ্বুদ্ধি লাভ করেন, তখন তিনি নিবৃত্তিমার্গ বা মুক্তির পথ অবলম্বন করেন, এবং তার ফলে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণের পরিবর্তে তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যান। এটিই আবশ্যক।

শ্লোক ৩

অধর্মলক্ষণা নানা নরকাশ্চানুবর্ণিতাঃ ।
মন্বন্তরশ্চ ব্যাখ্যাত আদ্যঃ স্বায়ম্ভুবো যতঃ ॥ ৩ ॥

অধর্ম-লক্ষণাঃ—অধর্মস্বরূপ; **নানা**—বিবিধ; **নরকাঃ**—নরক; **চ**—ও; **অনুবর্ণিতাঃ**—বর্ণিত হয়েছে; **মন্বন্তরঃ**—মনুদের পরিবর্তন (ব্রহ্মার এক দিনে চোদ্দজন মনুর

আবির্ভাব হয়); **চ**—এবং; **ব্যাখ্যাতঃ**—বর্ণিত হয়েছে; **আদ্যঃ**—আদি; **স্বায়ম্ভুবঃ**—ব্রহ্মার পুত্র; **যতঃ**—যাতে।

অনুবাদ

আপনি (পঞ্চম স্কন্ধের শেষে) অধর্মস্বরূপ যে নানাবিধ নরক রয়েছে, তারও বর্ণনা করেছেন, এবং আপনি (চতুর্থ স্কন্ধে) প্রথম যে মন্বন্তরে ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু আবির্ভূত হন, সেই আদ্য মন্বন্তরের কথাও বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৪-৫

প্রিয়ব্রতোত্তানপদোর্বংশস্তচ্চরিতানি চ ।
দ্বীপবর্ষসমুদ্রাদ্রিনদ্যুদ্যানবনস্পতীন্ ॥ ৪ ॥
ধরামণ্ডলসংস্থানং ভাগলক্ষণমানতঃ ।
জ্যোতিষাং বিবরাণাং চ যথেদমসৃজদ্বিভুঃ ॥ ৫ ॥

প্রিয়ব্রত—প্রিয়ব্রত; **উত্তানপদোঃ**—এবং উত্তানপাদের; **বংশঃ**—বংশ; **তৎ-চরিতানি**—এবং তাদের চরিত্র; **চ**—ও; **দ্বীপ**—বিভিন্ন লোক; **বর্ষ**—বর্ষ; **সমুদ্র**—সমুদ্র; **অদ্রি**—পর্বত; **নদী**—নদী; **উদ্যান**—উদ্যান; **বনস্পতীন্**—বৃক্ষরাজি; **ধরা-মণ্ডল**—পৃথিবীর; **সংস্থানম্**—অবস্থান; **ভাগ**—বিভাগ অনুসারে; **লক্ষণ**—বিভিন্ন লক্ষণ; **মানতঃ**—এবং আয়তন; **জ্যোতিষাম্**—সূর্য এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্কের; **বিবরাণাম্**—পাতালের; **চ**—এবং; **যথা**—যেমন; **ইদম্**—এই; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করেছেন; **বিভুঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনি প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের বংশ এবং চরিত্র বর্ণনা করেছেন। পরমেশ্বর ভগবান যেভাবে বিভাগ, লক্ষণ এবং পরিমাণ নির্দেশ করে বিভিন্ন লোক, বর্ষ, নদী, উদ্যান, বনস্পতি প্রভৃতি সৃষ্টি করেছেন এবং যেভাবে ভূমণ্ডল, জ্যোতিষচক্র ও পাতাল আদি লোকের সংস্থান করেছেন, আপনি তাও বর্ণনা করেছেন।

তাৎপর্য

এখানে *যথেদমসৃজদ্বিভুঃ* শব্দগুলি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, সর্বশক্তিমান ভগবান বিভিন্ন লোক, নক্ষত্র আদি সমন্বিত সমস্ত জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। নাস্তিকেরা

প্রতিটি সৃষ্টির পিছনে যে ভগবানের হাত রয়েছে, সেই কথা অস্বীকার করতে চায়, কিন্তু তারা বিশ্লেষণ করতে পারে না ভগবানের শক্তি এবং বুদ্ধিমত্তা ব্যতীত কিভাবে এই জগৎ সৃষ্টি হতে পারে। কেবল কল্পনা করা অথবা অনুমান করা সময়ের অপচয় মাত্র। *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) ভগবান বলেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবো*—"আমিই সব কিছুর উৎস।" *মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*—"এই সৃষ্টিতে যা কিছু বিদ্যমান তা সব আমার থেকেই প্রকাশ হয়েছে।" *ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ*—"কেউ যখন পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, সর্বশক্তিমান আমিই সব কিছু সৃষ্টি করেছি, তখন সে আমার প্রতি দৃঢ় ভক্তিপরায়ণ হয়ে আমার শরণাগত হয়।" দুর্ভাগ্যবশত মূর্খ মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণের সর্বশক্তিমত্তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা যদি ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করে এবং প্রামাণিক গ্রন্থাবলী পাঠ করে, তা হলে বহু জন্ম-জন্মান্তর লাগলেও, ধীরে ধীরে তারা যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারবে। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) বলেছেন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

"বহু জন্মের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে সর্বকারণের পরম কারণরূপে জেনে আমার শরণাগত হন। সেইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।" বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণ সব কিছুর স্রষ্টা, এবং তাঁরই শক্তি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (৭/৪-৫) সেই কথা বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে যে, জড়া শক্তি (*ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ*) এবং পরা শক্তি সম্ভূত জীবভূত—এই দুই-এর সমন্বয় সমগ্র সৃষ্টিতে বিরাজ করছে। অতএব সেই একই তত্ত্ব, জড় উপাদানসমূহ এবং পরম আত্মা—এই দুই-এর সমন্বয়ই, সৃষ্টির কারণ।

শ্লোক ৬

অধুনেহ মহাভাগ যথৈব নরকান্নরঃ ।
নানোগ্রযাতনান্ নেয়াৎ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৬ ॥

অধুনা—এখন; **ইহ**—এই জড় জগতে; **মহাভাগ**—হে মহাভাগ্যবান শুকদেব গোস্বামী; **যথা**—যাতে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **নরকান্**—সেই সমস্ত নরকে, যেখানে পাপীদের যন্ত্রণা দেওয়া হয়; **নরঃ**—মানুষ; **নানা**—বিবিধ; **উগ্র**—ভয়ঙ্কর; **যাতনান্**—যন্ত্রণা; **ন ঈয়াৎ**—ভোগ করতে না হয়; **তৎ**—তা; **মে**—আমার কাছে; **ব্যাখ্যাতুম্ অর্হসি**—দয়া করে বর্ণনা করুন।

অনুবাদ

হে মহাভাগ শুকদেব গোস্বামী, যে উপায় অবলম্বন করলে মানুষকে নানা প্রকার অসহ্য যন্ত্রণাময় নরকে পতিত হতে হয় না, এখন আপনি আমার কাছে সেই উপায় কৃপাপূর্বক ব্যাখ্যা করুন।

তাৎপর্য

পঞ্চম স্কন্ধের ষড়্‌বিংশতি অধ্যায়ে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে, যারা পাপ আচরণ করে তাদের নরকে নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। এখন ভগবদ্ভক্ত পরীক্ষিৎ মহারাজ চিন্তান্বিত হয়েছেন কিভাবে মানুষকে সেই নরক-যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করা যায়। বৈষ্ণব পর দুঃখে দুঃখী; অর্থাৎ তাঁর নিজের কোন দুঃখ নেই, কিন্তু যখন তিনি অন্যদের দুঃখ দর্শন করেন, তখন তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, "হে ভগবান, আমার নিজের কোন সমস্যা নেই, কারণ আমি আপনার দিব্য গুণাবলী কীর্তন করার ফলে অপার আনন্দ আস্বাদন করছি। কিন্তু, যে সমস্ত মূর্খ মায়াসুখে আচ্ছন্ন হয়ে আপনার প্রতি ভক্তিপরায়ণ নয়, তাদের কথা চিন্তা করেই কেবল আমার দুঃখ হচ্ছে।" বৈষ্ণব এই রকম সমস্যার সম্মুখীন হন। বৈষ্ণব যেহেতু সর্বতোভাবে ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন, তাই তাঁর কোন সমস্যা থাকে না; কিন্তু যেহেতু তিনি অধঃপতিত বদ্ধ জীবদের প্রতি কৃপাপরায়ণ, তাই সর্বদা তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে কিভাবে তাদের নারকীয় জীবন থেকে রক্ষা করা যায়, সেই চিন্তা করেন। তাই পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছে ব্যাকুলভাবে জানতে চেয়েছেন, কিভাবে মানুষকে নরকে অধঃপতিত হওয়া থেকে উদ্ধার করা যায়। শুকদেব গোস্বামী পূর্বেই বিশ্লেষণ করেছেন, মানুষ কিভাবে নরকে পতিত হয় এবং কিভাবে সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, সেই উপায়ও তিনি বিশ্লেষণ করতে পারেন। বুদ্ধিমান মানুষদের এই সমস্ত উপদেশের সদ্ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভক্তির প্রচণ্ড অভাব এবং তাই অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে জীবেরা নানা রকম দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে এবং তারা বিশ্বাস পর্যন্ত করে না যে, এই জীবনের পরে আর একটি জীবন রয়েছে। পরলোক সম্বন্ধে তাদের প্রত্যয় উৎপাদন করা অত্যন্ত কঠিন, কারণ জড় সুখের প্রচেষ্টায় তারা উন্মাদ হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের, প্রতিটি সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তাদের উদ্ধার করা। যাঁরা তাদের উদ্ধার করতে পারেন, মহারাজ পরীক্ষিৎ হচ্ছেন তাঁদেরই প্রতিনিধি।

শ্লোক ৭

শ্রীশুক উবাচ

ন চেদিহৈবাপচিতিং যথাংহসঃ
কৃতস্য কুর্যান্মনউক্তপাণিভিঃ
ধ্রুবং স বৈ প্রেত্য নরকানুপৈতি
যে কীর্তিতা মে ভবতস্তিগ্মযাতনাঃ ॥ ৭ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ন**—না; **চেৎ**—যদি; **ইহ**—এই জীবনে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অপচিতিম্**—প্রায়শ্চিত্ত; **যথা**—যথাযথভাবে; **অংহসঃ কৃতস্য**—পাপকর্ম করে; **কুর্যাৎ**—অনুষ্ঠান করে; **মনঃ**—মন; **উক্ত**—বাণী; **পাণিভিঃ**—এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **ধ্রুবম্**—নিঃসন্দেহে; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **প্রেত্য**—মৃত্যুর পর; **নরকান্**—বিভিন্ন প্রকার নরক; **উপৈতি**—প্রাপ্ত হয়; **যে**—যা; **কীর্তিতাঃ**—পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে; **মে**—আমার দ্বারা; **ভবতঃ**—আপনাকে; **তিগ্ম-যাতনাঃ**—অসহ্য যন্ত্রণাপূর্ণ।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন—হে রাজন্, মৃত্যুর পূর্বে এই জীবনেই মন, বাক্য এবং শরীর দ্বারা যে পাপ আচরণ করা হয়েছে, মনুসংহিতা এবং অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে মানুষ যদি যথাযথভাবে তার প্রায়শ্চিত্ত না করে, তা হলে মৃত্যুর পরে তাকে নরকে অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করতে হবে, যে কথা আমি পূর্বেই আপনার কাছে বর্ণনা করেছি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ যদিও শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন, তবুও শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তখনই তাঁকে ভগবদ্ভক্তির প্রভাব সম্বন্ধে বলেননি। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) উল্লেখ করা হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

ভগবদ্ভক্তির এমনই প্রভাব যে, কেউ যদি সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে তাঁর প্রতি পূর্ণরূপে ভক্তিপরায়ণ হন, তা হলে তিনি তাঁর সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়ে যাবেন।

ভগবদ্গীতায় অন্যত্র (১৮/৬৬) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, কেউ যদি অন্য সমস্ত কর্তব্যকর্ম পরিত্যাগ করে সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হন, তা হলে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, *অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি* —"আমি তোমার সমস্ত পাপের ফল থেকে তোমাকে মুক্ত করব।" তাই পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে তাঁর গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তৎক্ষণাৎ ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য বিশ্লেষণ করতে পারতেন। কিন্তু পরীক্ষিৎ মহারাজের বুদ্ধির পরীক্ষা করার জন্য তিনি প্রথমে কর্মকাণ্ডের সকাম কর্মের মার্গ অনুসারে প্রায়শ্চিত্তের বিধান বর্ণনা করেছেন। কর্মকাণ্ডের জন্য *মনুসংহিতা* আদি আশিটি প্রামাণিক শাস্ত্র রয়েছে, যেগুলিকে বলা হয় ধর্মশাস্ত্র। এই সমস্ত শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার সকাম কর্মের দ্বারা পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। শুকদেব গোস্বামী প্রথমে পরীক্ষিৎ মহারাজের কাছে সেই পন্থা বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই কথাও সত্যি যে, ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন না করলে, এই সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে পাপকর্মের প্রতিকারের জন্য পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করতে হয়। তাকে বলা হয় প্রায়শ্চিত্ত।

শ্লোক ৮

তস্মাৎ পুরৈবাশ্বিহ পাপনিষ্কৃতৌ
যতেত মৃত্যোরবিপদ্যতাত্মনা ।
দোষস্য দৃষ্টা গুরুলাঘবং যথা
ভিষক্ চিকিৎসেত রুজাং নিদানবিৎ ॥ ৮ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **পুরা**—পূর্বে; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **আশু**—অতি শীঘ্র; **ইহ**—এই জীবনে; **পাপ-নিষ্কৃতৌ**—পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য; **যতেত**—যত্ন করা উচিত; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যু; **অবিপদ্যত**—জরা এবং ব্যাধিগ্রস্ত না হয়ে; **আত্মনা**—দেহের দ্বারা; **দোষস্য**—পাপের; **দৃষ্টা**—বিবেচনা করে; **গুরু-লাঘবম্**—গুরুত্ব অথবা লঘুত্ব; **যথা**—ঠিক যেমন; **ভিষক্**—বৈদ্য; **চিকিৎসেত**—চিকিৎসা করেন; **রুজাম্**—রোগের; **নিদানবিৎ**—নিরূপণ করতে অভিজ্ঞ।

অনুবাদ

অতএব মৃত্যুর পূর্বেই, শরীর সুস্থ থাকতে থাকতে, শীঘ্রই শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানে যত্নবান হওয়া উচিত; তা না হলে সময় নষ্ট হয়ে যাবে এবং

পাপের ফল বর্ধিত হবে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন রোগের গুরুত্ব এবং লঘুত্ব বিবেচনা করে চিকিৎসা করেন, তেমনই পাপের মহত্ত্ব এবং অল্পত্ব বিবেচনা করে সেই অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

মনুসংহিতা আদি ধর্মশাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, হত্যাকারীকে ফাঁসি দেওয়া উচিত এবং এইভাবে তার জীবন উৎসর্গ করার ফলে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। পূর্বে এই প্রথাটি সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচলিত ছিল, কিন্তু যেহেতু এখন মানুষেরা নাস্তিক হয়ে গেছে, তাই প্রাণদণ্ড বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই বিবেচনাটি মোটেই বিচক্ষণ নয়। এখানে বলা হয়েছে যে, রোগনির্ণয়ে সক্ষম বৈদ্য রোগ অনুসারে ঔষধ দেন। রোগ যদি কঠিন হয়, তা হলে তার ওষুধটিও অবশ্যই কড়া হবে। হত্যাকারীর পাপের ভার অত্যন্ত বিশাল, তাই মনুসংহিতা অনুসারে হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা অবশ্য কর্তব্য। হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ড দিয়ে সরকার তার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করে, কারণ এই জীবনে যদি তাকে প্রাণদণ্ড না দেওয়া হয়, তা হলে তার পরবর্তী জীবনে তাকে নৃশংসভাবে নিহত হতে হবে এবং বহু দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে। যেহেতু মানুষ পরলোক এবং প্রকৃতির জটিল কার্যকলাপের কথা কিছুই জানে না, তাই তারা তাদের নিজেদের মনগড়া আইন তৈরি করে, কিন্তু তাদের কর্তব্য শাস্ত্রের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইনগুলি যথাযথভাবে আলোচনা করে সেই অনুসারে আচরণ করা। ভারতবর্ষে আজও হিন্দুসমাজ পাপের বোঝা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কিভাবে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, সেই সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের উপদেশ গ্রহণ করেন। খ্রিস্টধর্মেও পাদ্রীর কাছে পাপস্বীকার এবং প্রায়শ্চিত্ত করার প্রথা রয়েছে। অতএব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন এবং পাপের গুরুত্ব অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।

শ্লোক ৯

শ্রীরাজোবাচ

দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং যৎ পাপং জানন্নপ্যাত্মনোঽহিতম্ ।
করোতি ভূয়ো বিবশঃ প্রায়শ্চিত্তমথো কথম্ ॥ ৯ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **দৃষ্ট**—দর্শন করে; **শ্রুতাভ্যাম্**—(শাস্ত্র অথবা আইনের গ্রন্থ থেকে) শ্রবণ করে; **যৎ**—যেহেতু; **পাপম্**—পাপ, অপরাধজনক

কার্য; **জানন্**—জেনে; **অপি**—যদিও; **আত্মনঃ**—নিজের; **অহিতম্**—ক্ষতিকর; **করোতি**—সে আচরণ করে; **ভূয়ঃ**—বার বার; **বিবশঃ**—নিজেকে সংযত করতে না পেরে; **প্রায়শ্চিত্তম্**—প্রায়শ্চিত্ত; **অথো**—অতএব; **কথম্**—তার কি মূল্য।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—মানুষ জানে যে, পাপকর্ম করা তার পক্ষে অকল্যাণকর, কারণ সে দেখতে পায় যে, রাষ্ট্রের আইনে পাপী দণ্ডিত হয়, সাধারণ মানুষেরা তাকে তিরস্কার নিন্দা করে এবং শাস্ত্র ও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে সে জানতে পারে যে, পাপীকে পরবর্তী জীবনে নরকে যন্ত্রণাভোগ করতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ বার বার পাপকর্মে লিপ্ত হয়, এমন কি প্রায়শ্চিত্ত করার পরেও। অতএব, এই প্রকার প্রায়শ্চিত্তের কি মূল্য আছে?

তাৎপর্য

কোন কোন ধর্মে পাপী ব্যক্তি পুরোহিতের কাছে গিয়ে তার পাপ স্বীকার করে এবং কিছু জরিমানা দেয়, তারপর আবার সে পাপকর্ম করে পুরোহিতের কাছে সেই পাপের কথা স্বীকার করতে যায়। এইগুলি হচ্ছে পেশাদারী পাপীদের আচরণ। মহারাজ পরীক্ষিতের এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, পাঁচ হাজার বছর আগেও অপরাধীরা তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে আবার পাপকর্মে লিপ্ত হত, যেন তা করতে তারা বাধ্য হত। তাই তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে পরীক্ষিৎ মহারাজ দেখেছিলেন যে, বার বার পাপ করে প্রায়শ্চিত্ত করার প্রথাটি অর্থহীন। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত, সে যত বড়ই দণ্ডভোগ করুক না কেন, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ থেকে বিরত হওয়ার শিক্ষা প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সে বার বার সেই পাপকর্ম করতে থাকবে। এখানে ব্যবহৃত *বিবশঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, পাপকর্ম করতে অনিচ্ছুক হলেও অভ্যাসবশত মানুষ পাপকর্ম করতে বাধ্য হয়। পরীক্ষিৎ মহারাজ তাই বিবেচনা করেছেন যে, পাপ আচরণ থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য প্রায়শ্চিত্তের পন্থা মোটেই তেমন কার্যকরী নয়। পরবর্তী শ্লোকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন কেন তিনি এই পন্থাটি পরিত্যাগ করছেন।

শ্লোক ১০

ক্বচিন্নিবর্ততেঽভদ্রাৎ ক্বচিচ্চরতি তৎ পুনঃ ।
প্রায়শ্চিত্তমথোঽপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ ॥ ১০ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **নিবর্ততে**—নিবৃত্ত হয়; **অভদ্রাৎ**—পাপকর্ম থেকে; **ক্বচিৎ**—কখনও; **চরতি**—আচরণ করে; **তৎ**—তা (পাপকর্ম); **পুনঃ**—পুনরায়; **প্রায়শ্চিত্তম্**—প্রায়শ্চিত্তের পন্থা; **অথো**—অতএব; **অপার্থম্**—নিরর্থক; **মন্যে**—আমি মনে করি; **কুঞ্জর-শৌচবৎ**—হস্তীস্নানের মতো।

অনুবাদ

পাপকর্ম না করার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ব্যক্তিও কখনও কখনও পুনরায় পাপকর্মে লিপ্ত হয়, তাই আমি এই প্রায়শ্চিত্তের পন্থাকে হস্তীস্নানের মতো নিরর্থক বলে মনে করি। কারণ হস্তী স্নান করার পর ডাঙ্গায় উঠে এসেই তার মাথায় এবং গায়ে ধূলি নিক্ষেপ করে।

তাৎপর্য

পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন প্রশ্ন করেছিলেন কিভাবে পাপকর্ম থেকে মুক্ত হওয়া যায় যাতে মৃত্যুর পর নরকে না যেতে হয়, তার উত্তরে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রায়শ্চিত্তের পন্থা বর্ণনা করেছিলেন। এইভাবে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা করেছিলেন এবং পরীক্ষিৎ মহারাজ সেই পন্থাটি যথার্থ বলে স্বীকার না করে, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এখন পরীক্ষিৎ মহারাজ তাঁর গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে অন্য একটি উত্তরের প্রত্যাশা করছেন।

শ্লোক ১১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

কর্মণা কর্মনির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে ।
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্ ॥ ১১ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ উবাচ—বেদব্যাস-নন্দন শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **কর্মণা**—সকাম কর্মের দ্বারা; **কর্ম-নির্হারঃ**—সকাম কর্মের নিবৃত্তি; **ন**—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **আত্যন্তিকঃ**—অন্তিম; **ইষ্যতে**—সম্ভব হয়; **অবিদ্বৎ-অধিকারিত্বাৎ**—অজ্ঞান হওয়ার ফলে; **প্রায়শ্চিত্তম্**—প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত; **বিমর্শনম্**—বেদান্তের পূর্ণজ্ঞান।

অনুবাদ

বেদব্যাস-নন্দন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন—হে রাজন্, যেহেতু পাপকর্মের ফল নিষ্ক্রিয় করার এই পন্থাটিও সকাম কর্ম, তাই তার দ্বারা কর্মের

বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। যারা প্রায়শ্চিত্তের বিধি অনুসরণ করে, তারা মোটেই বুদ্ধিমান নয়। প্রকৃতপক্ষে, তারা তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তমোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত না হয়, ততক্ষণ একটি কর্মের দ্বারা অন্য কর্মের প্রতিকারের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়, কেননা তার ফলে কর্মবাসনা সমূলে উৎপাটিত হয় না। আপাতদৃষ্টিতে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের পুণ্যবান বলে মনে হলেও তারা পুনরায় পাপকর্মে লিপ্ত হবে, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তাই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে বেদান্তের পূর্ণজ্ঞান লাভ করা, যার দ্বারা পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

তাৎপর্য

পরীক্ষিৎ মহারাজের গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন এবং আমরা দেখতে পাই যে, পরীক্ষিৎ মহারাজ প্রায়শ্চিত্তের পন্থাকে সকাম কর্ম বলে বুঝতে পেরে তা প্রত্যাখ্যান করে, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এখন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মনোধর্মী জ্ঞানের বিষয়ে বলছেন। কর্মকাণ্ড থেকে জ্ঞানকাণ্ডে অগ্রসর হয়ে তিনি প্রস্তাব করছেন *প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্*—"পূর্ণজ্ঞান হচ্ছে প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত।" *বিমর্শনম্* শব্দটির অর্থ মনোধর্মী জ্ঞানের অনুশীলন। *ভগবদ্গীতায়* জ্ঞানহীন কর্মীদের গর্দভের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৫) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

"মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবসম্পন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা কখনও আমার শরণাগত হয় না।" এইভাবে পাপকর্মে লিপ্ত কর্মীদের এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যারা অবগত নয়, তাদের মূঢ় বা গর্দভ বলা হয়েছে। *বিমর্শন* শব্দটির বিশ্লেষণ *ভগবদ্গীতাতেও* (১৫/১৫) করা হয়েছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—বেদ অধ্যয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা। কেউ যদি বেদান্ত অধ্যয়ন করে কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানকে না জেনে কেবল মনোধর্মী জ্ঞানের পথে কিছুটা অগ্রসর হয়, তা হলে সে মূঢ়ই থেকে যায়। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) বলা হয়েছে যে, প্রকৃত জ্ঞান মানুষ তখনই লাভ করেন, যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে জেনে তাঁর শরণাগত হন (*বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে*)। প্রকৃত জ্ঞান লাভ করার জন্য এবং জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাই শ্রীকৃষ্ণকে জানার

চেষ্টা করা উচিত। কারণ তার ফলে মানুষ সমস্ত পাপ এবং পুণ্যকর্মের ফল থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ১২

নাশ্নতঃ পথ্যমেবান্নং ব্যাধয়োঽভিভবন্তি হি ।
এবং নিয়মকৃদ্রাজন্ শনৈঃ ক্ষেমায় কল্পতে ॥ ১২ ॥

ন—না; **অশ্নতঃ**—যে আহার করে; **পথ্যম্**—উপযুক্ত পথ্য; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অন্নম্**—অন্ন; **ব্যাধয়ঃ**—বিভিন্ন প্রকার রোগ; **অভিভবন্তি**—দমন করে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **এবম্**—তেমনই; **নিয়মকৃৎ**—নিয়ম পালনকারী; **রাজন্**—হে রাজন্; **শনৈঃ**—ক্রমশ; **ক্ষেমায়**—মঙ্গলের জন্য; **কল্পতে**—উপযুক্ত হন।

অনুবাদ

হে রাজন্, রোগী যেমন চিকিৎসকের দেওয়া পথ্য আহারের ফলে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে এবং তাকে যেমন ব্যাধি আর আক্রমণ করতে পারে না, তেমনই, যিনি জ্ঞানের বিধি-নিষেধগুলি পালন করে চলেন, তিনি ক্রমে ক্রমে জড় কলুষ থেকে মুক্তির পথে অগ্রসর হন।

তাৎপর্য

কেউ যদি মনোধর্মী জ্ঞানেরও অনুশীলন করেন এবং শাস্ত্র-নির্দেশিত বিধি-নিষেধগুলি পালন করেন, তা হলে তিনি ক্রমশ শুদ্ধ হবেন, যে কথা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই কর্মমার্গ থেকে জ্ঞানমার্গ শ্রেষ্ঠ। কর্মের স্তর থেকে নরকে অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু জ্ঞানের স্তরে, সম্পূর্ণরূপে ভবরোগ থেকে মুক্ত না হলেও, নরকে অধঃপতনের সম্ভাবনা থাকে না। তবে অসুবিধাটি হচ্ছে এই যে, জ্ঞানের স্তরে মানুষ মনে করে সে মুক্ত হয়ে গেছে এবং নারায়ণ অথবা ভগবান হয়ে গেছে। এটি আর এক প্রকার অবিদ্যা।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/২/৩২)

অজ্ঞানতাবশত জড় কলুষ থেকে মুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও, সে নিজেকে মুক্ত বলে অভিমান করে। তাই ব্রহ্মজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ না করার ফলে তার পুনরায় অধঃপতন হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, জ্ঞানীরা অন্তত জানেন পুণ্যকর্ম কি এবং পাপকর্ম কি এবং তাঁরা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন।

শ্লোক ১৩-১৪

তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শমেন চ দমেন চ ।
ত্যাগেন সত্যশৌচাভ্যাং যমেন নিয়মেন বা ॥ ১৩ ॥
দেহবাগ্‌বুদ্ধিজং ধীরা ধর্মজ্ঞাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
ক্ষিপন্ত্যঘং মহদপি বেণুগুল্মমিবানলঃ ॥ ১৪ ॥

তপসা—তপস্যা বা স্বেচ্ছায় জড় সুখ ত্যাগ করার দ্বারা; **ব্রহ্মচর্যেণ**—ব্রহ্মচর্যের দ্বারা; **শমেন**—মনঃসংযমের দ্বারা; **চ**—এবং; **দমেন**—পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা; **চ**—ও; **ত্যাগেন**—সদুদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় দান করার দ্বারা; **সত্য**—সত্যের দ্বারা; **শৌচাভ্যাম্**—বিধি-বিধান পালনের দ্বারা অন্তরে এবং বাইরে নিজেকে পরিষ্কার রাখার দ্বারা; **যমেন**—অহিংসার দ্বারা; **নিয়মেন**—নিয়মিতভাবে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের দ্বারা; **বা**—এবং; **দেহ-বাক্-বুদ্ধিজম্**—দেহ, বাণী এবং বুদ্ধির দ্বারা অনুষ্ঠিত; **ধীরাঃ**—ধীর ব্যক্তিগণ; **ধর্মজ্ঞাঃ**—ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁরা পূর্ণরূপে অবগত; **শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ**—শ্রদ্ধা সমন্বিত; **ক্ষিপন্তি**—ধ্বংস করে; **অঘম্**—সর্বপ্রকার পাপ; **মহৎ অপি**—অত্যন্ত জঘন্য হলেও; **বেণুগুল্মম্**—বাঁশগাছের নীচের শুষ্ক লতা; **ইব**—সদৃশ; **অনলঃ**—অগ্নি।

অনুবাদ

মনকে একাগ্র করার জন্য ব্রহ্মচর্য পালন অবশ্য কর্তব্য এবং কখনও সেই স্তর থেকে পতিত হওয়া উচিত নয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করে তপশ্চর্যা করা উচিত। মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করা উচিত। দান করা উচিত, সত্যনিষ্ঠ হওয়া উচিত, শুচি এবং অহিংস হওয়া উচিত, বিধি-নিষেধ পালন করা উচিত এবং নিয়মিতভাবে ভগবানের দিব্য নাম জপ করা উচিত। এইভাবে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত শ্রদ্ধা সমন্বিত ধীর ব্যক্তি তাঁর দেহ, বাণী এবং মনের দ্বারা কৃত সমস্ত পাপ থেকে সাময়িকভাবে পবিত্র হন। সেই পাপগুলি বাঁশঝাড়ের নীচে

শুকনো লতার মতো, যেগুলি আগুনে পোড়ানো হলেও তাদের মূল থেকে প্রথম সুযোগেই আবার সেই লতাগুলি গজাতে থাকে।

তাৎপর্য

স্মৃতিশাস্ত্রে তপঃ শব্দটির বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—*মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চ ঐকাগ্র্যং পরমং তপঃ* । "মন ও ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ সংযম এবং কোন কার্যে তার পূর্ণ একাগ্রতাকে বলা হয় *তপঃ* ।" আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে কিভাবে মনকে ভগবানের সেবায় একাগ্র করতে হয়। সেটিই হচ্ছে সর্বোত্তম *তপঃ* । ব্রহ্মচর্যের আটটি অঙ্গ—মেয়েদের কথা চিন্তা না করা, যৌন জীবন সম্বন্ধে আলোচনা না করা, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা না করা, কামপূর্ণ দৃষ্টিতে মেয়েদের দিকে না দেখা, মেয়েদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে কথা না বলা, মৈথুন বিষয়ে সংকল্প না করা, মৈথুনের চেষ্টা না করা অথবা মৈথুনে লিপ্ত না হওয়া। মেয়েদের কথা চিন্তা করা উচিত নয় অথবা তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়, সুতরাং তাদের সঙ্গে কথা বলা তো দূরের কথা। এটিই হচ্ছে সর্বোত্তম ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচারী অথবা সন্ন্যাসী যদি কোনও রমণীর সঙ্গে নির্জন স্থানে কথা বলে, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই সকলের অজান্তে যৌন সম্পর্কের সম্ভাবনা থাকবে। তাই আদর্শ ব্রহ্মচারী ঠিক বিপরীতভাবে আচরণ করবেন। কেউ যদি যথাযথভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করতে পারবেন এবং দান, সত্যবাদিতা আদি আচরণগুলিও অনুষ্ঠান করতে পারবেন। কিন্তু শুরুতেই জিহ্বা এবং আহার সংযত করা অবশ্য কর্তব্য।

ভক্তিমার্গে প্রথমেই জিহ্বা সংযত করার মাধ্যমে বিধি-নিষেধগুলি অনুসরণ করা কর্তব্য (*সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ*)। অন্য কোনও বিষয়ে আলোচনা না করে কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে এবং শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন না করে কোনও খাদ্য গ্রহণ না করার মাধ্যমে জিহ্বাকে সংযত করা যায়। কেউ যদি এইভাবে জিহ্বাকে সংযত করে, তা হলে ব্রহ্মচর্য এবং চিত্তশুদ্ধির অন্যান্য সমস্ত সাধনগুলি আপনা থেকেই সাধিত হবে। পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হবে যে, ভগবদ্ভক্তির পন্থা সর্বতোভাবে পূর্ণ এবং তাই তা কর্ম ও জ্ঞানের পন্থা থেকে শ্রেষ্ঠ। *বেদ* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রীল বীররাঘব আচার্য বিশ্লেষণ করেছেন যে, যতখানি সম্ভব পূর্ণরূপে উপবাসের মাধ্যমে তপশ্চর্যা সম্পাদিত হয় (*তপসানাশকেন*)। শ্রীল রূপ গোস্বামীও উপদেশ দিয়েছেন, অত্যাহার পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হওয়ার একটি মস্ত বড় প্রতিবন্ধক। *ভগবদ্গীতাতেও* (৬/১৭)

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু ।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥

"যিনি পরিমিত আহার ও বিহার করেন, পরিমিত প্রয়াস করেন, যাঁর নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, তিনিই যোগ অভ্যাসের দ্বারা সমস্ত জড়-জাগতিক দুঃখের নিবৃত্তিসাধন করতে পারেন।"

চতুর্দশ শ্লোকে *ধীরাঃ* শব্দটি, অর্থাৎ 'যাঁরা সর্ব অবস্থাতেই অবিচলিত থাকেন', অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (২/১৪) অর্জুনকে বলেছেন—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥

"হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগের ফলে অনিত্য সুখ এবং দুঃখের অনুভব হয়, সেইগুলি ঠিক যেন শীত এবং গ্রীষ্ম ঋতুর গমনাগমনের মতো। হে ভরতকুল-প্রদীপ, সেই ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সেগুলি সহ্য করার চেষ্টা কর।" বদ্ধ জীবনে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক বহু প্রকার ক্লেশ রয়েছে। কিন্তু যিনি এই সমস্ত ক্লেশ সত্ত্বেও সর্ব অবস্থাতেই অবিচলিত থাকেন, তাঁকে বলা হয় *ধীর* ।

শ্লোক ১৫

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥ ১৫ ॥

কেচিৎ—কোন কোন মানুষ; **কেবলয়া ভক্ত্যা**—অহৈতুকী ভক্তি সম্পাদনের দ্বারা; **বাসুদেব**—সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **পরায়ণাঃ**—(তপশ্চর্যা, জ্ঞানের প্রয়াস অথবা সকাম কর্মের প্রচেষ্টা ইত্যাদির উপর নির্ভর না করে কেবল ভগবদ্ভক্তিতেই) সম্পূর্ণরূপে আসক্ত; **অঘম্**—সর্বপ্রকার পাপকর্ম; **ধুন্বন্তি**—বিনষ্ট করে; **কার্ৎস্ন্যেন**—সম্পূর্ণরূপে (পাপ বাসনার পুনরুদ্গমের সম্ভাবনা রহিত হয়ে); **নীহারম্**—কুয়াশা; **ইব**—সদৃশ; **ভাস্করঃ**—সূর্য।

অনুবাদ

যাঁরা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁরাই কেবল পাপকর্মরূপ আগাছাকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারেন এবং সেই আগাছাগুলির

পুনরুদ্‌গমের আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের প্রভাবেই কেবল তা সম্ভব হয়, ঠিক যেমন সূর্য তার কিরণের দ্বারা অচিরেই কুয়াশা দূর করে দেয়।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বাঁশগাছের ঝাড়ের তলায় শুকনো লতাগুল্ম যেমন আগুনে ভস্মীভূত করা হলেও, মাটিতে তার শিকড় থাকার ফলে পুনরায় তাদের গজিয়ে ওঠার সম্ভাবনার দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন। তেমনই, জ্ঞানাগ্নির দ্বারা পাপরূপ লতাগুল্ম দগ্ধ হলেও ভগবদ্ভক্তির স্বাদ না পাওয়া পর্যন্ত পাপের মূল বিনষ্ট হয় না এবং তাই পাপ-বাসনার পুনরুদ্‌গমের সম্ভাবনা থাকে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/৪) উল্লেখ করা হয়েছে—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে ॥

মনোধর্মী জ্ঞানীরা পাপ এবং পুণ্য কর্মের পার্থক্য নিরূপণ করার মাধ্যমে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জড় জগৎকে জানবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তিতে স্থিত না হওয়া পর্যন্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রবণতা থেকে যায়। তারা অধঃপতিত হয়ে সকাম কর্মে লিপ্ত হতে পারে। কিন্তু কেউ যদি ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ হন, তা হলে পৃথকভাবে প্রচেষ্টা না করা সত্ত্বেও তাঁর জড় সুখভোগের বাসনা আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। *ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চ*—কেউ যদি কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হন, তা হলে পাপ এবং পুণ্য উভয় প্রকার জড়-জাগতিক কর্মের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা আসবে। সেটিই হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির স্বাদ। পুণ্য এবং পাপ উভয় প্রকার কর্মই অবিদ্যাজনিত। কারণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাসরূপে জীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে কোন কর্ম করার প্রয়োজন হয় না। তাই কেউ যখন ভগবদ্ভক্তির স্তরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন, তখন তিনি পাপ এবং পুণ্য উভয় প্রকার কর্মের প্রতি অনাসক্ত হয়ে কেবল শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানেই আগ্রহ করেন। এই ভক্তির পন্থা (*বাসুদেবপরায়ণ*) সমস্ত কর্মের ফল থেকে মানুষকে মুক্ত করে।

মহারাজ পরীক্ষিৎ যেহেতু একজন মহান ভক্ত ছিলেন, তাই কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধে তাঁর গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর উত্তরগুলি তাঁর সন্তুষ্টিবিধান করতে পারেনি। তাই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁর শিষ্যের অন্তরের কথা খুব ভালভাবে অবগত হয়ে, ভগবদ্ভক্তির দিব্য আনন্দময় পন্থা তাঁর কাছে বিশ্লেষণ করেছেন। এই শ্লোকে ব্যবহৃত *কেচিৎ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'অতি অল্প কয়েকজন'।

সকলেই কৃষ্ণভক্ত হতে পারে না। *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/৩) শ্রীকৃষ্ণ বিশ্লেষণ করেছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥

"হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কোন একজন সিদ্ধি লাভের জন্য যত্ন করেন, আর হাজার হাজার সিদ্ধদের মধ্যে কদাচিৎ একজন আমাকে অর্থাৎ আমার ভগবৎ-স্বরূপকে তত্ত্বত অবগত হন।" বস্তুতপক্ষে, কেউই শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণরূপে জানতে পারে না, কারণ পুণ্যকর্মের দ্বারা অথবা সর্বোচ্চ স্তরের জ্ঞান লাভ করার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, সর্বোত্তম জ্ঞান হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা।, যে সমস্ত নির্বোধ মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণকে জানে না, তারা অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মনে করে যে, তারা মুক্ত হয়ে গেছে কিংবা কৃষ্ণ অথবা নারায়ণ হয়ে গেছে। এটিই হচ্ছে অবিদ্যা।

ভগবদ্ভক্তির শুদ্ধতা বিশ্লেষণ করে শ্রীল রূপ গোস্বামী *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/১/১১) বলেছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

"সকাম কর্ম অথবা দার্শনিক জ্ঞানের প্রয়াসের দ্বারা কোন রকম জাগতিক লাভের প্রত্যাশা না করে, অনুকূলভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করা উচিত। তাকে বলা হয় শুদ্ধ ভক্তি।" শ্রীল রূপ গোস্বামী আরও বিশ্লেষণ করেছেন যে, ভক্তি হচ্ছে *ক্লেশঘ্নী শুভদা,* অর্থাৎ কেউ যখন ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তখন সব রকম অনর্থক পরিশ্রম এবং জড়-জাগতিক ক্লেশের সর্বতোভাবে নিবৃত্তি হয় এবং সমস্ত সৌভাগ্যের উদয় হয়। ভক্তি এতই শক্তিশালী যে, তাকে বলা হয় *মোক্ষলঘুতাকৃৎ*; অর্থাৎ, তা মোক্ষকেও তুচ্ছ করে দেয়।

অভক্তদের নানা প্রকার জড়-জাগতিক ক্লেশ সহ্য করতে হয়, কারণ তারা পাপকর্ম করে। অবিদ্যাবশত তাদের হৃদয়ে পাপকর্ম করার বাসনা থাকে। এই সমস্ত পাপকর্মগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—*পাতক, মহাপাতক* ও *অতিপাতক* এবং সেগুলিকেও আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—*প্রারব্ধ* ও *অপ্রারব্ধ* । *প্রারব্ধ* হচ্ছে সেই পাপকর্ম যার ফল এখন ভোগ হচ্ছে, এবং *অপ্রারব্ধ* হচ্ছে সেই সমস্ত পাপ যার ফল পরে ভোগ হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত পাপবীজ অঙ্কুরিত হয় না, তাকে বলা হয় *অপ্রারব্ধ* । এই সমস্ত পাপবীজ অদৃশ্য কিন্তু সেগুলি অসংখ্য এবং কখন যে তাদের প্রথম সূচনা হয়েছিল তা কেউই নির্ধারণ করতে

পারে না। যে পাপ ইতিমধ্যেই ফলপ্রসূ হয়েছে, সেই প্রারব্ধ কর্মের ফলে নীচকুলে জন্ম অথবা নানা প্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করতে দেখা যায়।

কিন্তু কেউ যখন ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তখন প্রারব্ধ, অপ্রারব্ধ এবং বীজ, সর্বপ্রকার পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/১৪/১৯) শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন—

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥

"হে উদ্ধব, আমার প্রতি ভক্তি জ্বলন্ত অগ্নির মতো সমস্ত পাপকে ভস্মীভূত করতে পারে।" ভগবদ্ভক্তি যে কিভাবে সমস্ত পাপকে বিনষ্ট করে, তা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/৩৩/৬) 'কপিল-দেবহূতি সংবাদে' বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দেবহূতি বলেছেন—

যন্নামধ্যেয়শ্রবণানুকীর্তনাদ্
যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥

"কুকুরভোজী পরিবারে যার জন্ম হয়েছে, সেও যদি একবার পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করে, তাঁর লীলা শ্রবণ করে, তাঁকে প্রণতি নিবেদন করে অথবা তাঁকে স্মরণ করে, তা হলে সে তৎক্ষণাৎ বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের যোগ্য হয়, অতএব যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন, তাঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে কি আর বলার আছে?"

পদ্মপুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁর চিত্ত সর্বদা ভগবদ্ভক্তিতে আসক্ত, তিনি অচিরেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন। এই পাপ চার প্রকার—ফলোন্মুখ, বীজ, কূট এবং অপ্রারব্ধ। এই সমস্ত পাপ ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়ে যায়। কারও হৃদয়ে যখন ভগবদ্ভক্তি বিরাজ করে, তখন আর সেখানে কোন পাপ-বাসনার স্থান থাকে না। অবিদ্যা অর্থাৎ ভগবানের নিত্যদাসরূপে নিজের স্বরূপ বিস্মৃতির ফলে পাপের উদয় হয়। কিন্তু কেউ যখন পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হন, তখন তিনি নিজেকে ভগবানের নিত্যদাসরূপে চিনতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, ভক্তি দুই প্রকার— (১) সন্ততা (সর্বদা বর্তমান ও নিষ্ঠাময়ী) এবং (২) কাদাচিৎকী (যা সর্বদা বর্তমান নয়, কখনও কখনও উদিত হয়)। সন্ততা ভক্তি আবার দুই প্রকার—(১) স্বল্প আসক্তিযুক্ত এবং (২) রাগময়ী। কাদাচিৎকী ভক্তি তিন প্রকার—(১) রাগাভাসময়ী,

(২) রাগাভাসশূন্য-স্বরূপভূতা এবং (৩) আভাসরূপা। এই আভাসরূপা ভক্তিতেই প্রায়শ্চিত্ত করার সমস্ত প্রয়োজন দূর হয়ে যায়। অতএব, যিনি কাদাচিৎকী ভক্তির উন্নত স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁর পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত করা সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রয়োজন। আভাসরূপা ভক্তির স্তরেই সমস্ত পাপ সমূলে উৎপাটিত হয়ে যায়। শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, *কার্ৎস্ন্যেন* শব্দটির অর্থ হচ্ছে পাপকর্ম করার বাসনা থাকলেও তা আভাসরূপা ভক্তির স্তরেই সমূলে উৎপাটিত হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে ভাস্কর বা সূর্যের দৃষ্টান্তটি অতি সুন্দর। ভক্তির আভাসের তুলনা করা হয় অরুণোদয়ের পূর্বে ক্ষীণ আলোকের সঙ্গে এবং পুঞ্জীভূত পাপের তুলনা করা হয় কুয়াশার সঙ্গে। কুয়াশা যেহেতু সমস্ত আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকে না, তাই সূর্যকে কেবলমাত্র তার সেই কিরণ বিতরণের থেকে অধিক আর কিছু করতে হয় না, এবং তার ফলেই কুয়াশা তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়। তেমনই, অল্পমাত্রায় ভগবদ্ভক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া মাত্রই পাপরূপ কুয়াশা তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়।

শ্লোক ১৬

ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপআদিভিঃ ।
যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণস্তৎপুরুষনিষেবয়া ॥ ১৬ ॥

ন—না; **তথা**—ততখানি; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অঘবান্**—পাপী; **রাজন্**—হে রাজন্; **পূয়েত**—পবিত্র হতে পারে; **তপঃ-আদিভিঃ**—তপশ্চর্যা, ব্রহ্মচর্য এবং শুদ্ধিকরণের অন্যান্য পন্থার দ্বারা; **যথা**—যতখানি; **কৃষ্ণ-অর্পিত-প্রাণঃ**—পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত; **তৎ-পুরুষ-নিষেবয়া**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধির সেবায় আত্মসমর্পণ করার দ্বারা।

অনুবাদ

হে রাজন্, কোন পাপী যদি ভগবদ্ভক্তের সেবায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করেন, তা হলে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হতে পারেন। আমি পূর্বেই বলেছি যে তপশ্চর্যা, ব্রহ্মচর্য এবং প্রায়শ্চিত্তের অন্যান্য পন্থার দ্বারা পবিত্র হওয়া যায় না।

তাৎপর্য

তৎপুরুষ শব্দটি শ্রীগুরুদেব-সদৃশ কৃষ্ণভক্তির প্রচারককে বোঝায়। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন, *ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা নিস্তার পায়েছে কেবা*—"আদর্শ বৈষ্ণব সদ্‌গুরুর সেবা না করে, কে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে?" এই সিদ্ধান্তটি অন্যান্য বহু স্থানেও ব্যক্ত হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/৫/২) বলা হয়েছে, *মহৎসেবাং*

দ্বারমাহুর্বিমুক্তেঃ—কেউ যদি মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই শুদ্ধ ভক্ত-মহাত্মার সেবা করতে হবে। দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই যিনি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তিনিই হচ্ছেন মহাত্মা। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৯/১৩) বলেছেন—

মহাত্মনস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥

"হে পার্থ, মোহমুক্ত মহাত্মাগণ আমার দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করেন। তাঁরা আমাকে সর্বভূতের কারণ ও অবিনাশী জেনে অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করেন।" অতএব মহাত্মার লক্ষণ হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত তাঁর আর অন্য কোন কৃত্য নেই। পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হতে হলে বৈষ্ণবের সেবা করতে হয়, কৃষ্ণভক্তি জাগরিত করতে হয় এবং কি করে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতে হয় সেই শিক্ষা লাভ করতে হয়। মহাত্মা-সেবার এটিই ফল। অবশ্য কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তের সেবা করেন, তা হলে আপনা থেকেই তাঁর সমস্ত পাপ দূর হয়ে যায়। ভগবদ্ভক্তির আবশ্যকতা নগণ্য পাপপুঞ্জ দূর করার জন্য নয়, পক্ষান্তরে সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত করার জন্য। সূর্যকিরণের প্রথম ঝলকেই যেমন কুয়াশা দূর হয়ে যায়, তেমনই শুদ্ধ ভক্তের সেবা করতে শুরু করা মাত্রই সমস্ত পাপ আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়; সেই জন্য অন্য কোন রকম প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না।

কৃষ্ণার্পিতপ্রাণঃ শব্দটি সেই ভক্তকে ইঙ্গিত করে, যিনি নরক থেকে উদ্ধার লাভের জন্য নয়, পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য তাঁর জীবন সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিবেদন করেন। ভগবদ্ভক্ত *নারায়ণপরায়ণ* বা *বাসুদেবপরায়ণ,* যার অর্থ, বাসুদেবের পন্থা বা ভগবদ্ভক্তির পন্থা হচ্ছে তাঁর জীবনসর্বস্ব। *নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/১৭/২৮)—এই প্রকার ভক্ত কোথাও যেতে ভীত হন না। একটি পথ উচ্চতর লোকে যাওয়ার এবং অন্যটি নরকে যাওয়ার, কিন্তু *নারায়ণপর* ভক্তকে যেখানেই পাঠানো হোক না কেন তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে চান। এই প্রকার ভক্ত স্বর্গ এবং নরকের বিচার করেন না; তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবার প্রতি আসক্ত। ভক্তকে যদি নরকেও যেতে হয়, তিনি তা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বলেই মনে করেন—*তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৮)। তিনি কখনও প্রতিবাদ করেন না, "আমি এত বড় কৃষ্ণভক্ত, আমাকে কেন এই দুঃখ কষ্ট দেওয়া হচ্ছে?" পক্ষান্তরে তিনি ভাবেন, "এটিই হচ্ছে কৃষ্ণের কৃপা।" শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধির সেবায় যিনি যুক্ত হয়েছেন, তাঁর পক্ষেই কেবল এই প্রকার মনোভাব সম্ভব। এটিই হচ্ছে সাফল্যের রহস্য।

শ্লোক ১৭

সধ্রীচীনো হ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ ।
সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ ১৭ ॥

সধ্রীচীনঃ—সমীচীন; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অয়ম্**—এই; **লোকে**—এই জগতে; **পন্থাঃ**—পথ; **ক্ষেমঃ**—শুভ; **অকুতঃ-ভয়ঃ**—নির্ভীক; **সুশীলাঃ**—সদাচারী; **সাধবঃ**—সাধু; **যত্র**—যেখানে; **নারায়ণপরায়ণাঃ**—যাঁরা নারায়ণের পথ ভগবদ্ভক্তিকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছেন।

অনুবাদ

সুশীল এবং সদ্‌গুণ-সম্পন্ন শুদ্ধ ভক্ত যে পথ অনুসরণ করেন, সেটিই এই জগতে সব চাইতে মঙ্গলময় পথ। সেই পথ ভয়বিহীন এবং শাস্ত্রের দ্বারা স্বীকৃত।

তাৎপর্য

কখনও মনে করা উচিত নয় যে, ভক্তিমার্গের অনুগামী ব্যক্তি বেদের কর্মকাণ্ডীয় নির্দেশ অনুষ্ঠান করতে পারেন না এবং জ্ঞানমার্গীয় আধ্যাত্মিক বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা করার মতো যথেষ্ট শিক্ষা তাঁর নেই। মায়াবাদীরা বলে যে, ভক্তির পথ স্ত্রী এবং অশিক্ষিতদের জন্য। তাদের এই বিচারটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। গোস্বামীগণ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, রামানুজাচার্য প্রমুখ মহাপণ্ডিতেরা ভক্তির পথ অনুসরণ করেছিলেন। তাঁরাই হচ্ছেন ভক্তিমার্গের প্রকৃত অনুগামী। উচ্চশিক্ষা অথবা উচ্চকুল নির্বিশেষে সকলেরই কর্তব্য তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ*—মহাজনদের পথ অনুগমন করা অবশ্য কর্তব্য। মহাজন হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা ভগবদ্ভক্তির পথ অবলম্বন করেছেন (*সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ*), কারণ এই সমস্ত মহাত্মারাই হচ্ছেন আদর্শ ব্যক্তি। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/১৮/১২) উল্লেখ করা হয়েছে—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।

"যাঁরা ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিপরায়ণ, তাঁদের মধ্যে দেবতাদের সমস্ত সদ্‌গুণের সমাবেশ হয়।" কিন্তু মূর্খলোকেরা ভ্রান্তিবশত মনে করে যে, ভক্তির পথ তাদের জন্য যারা কর্মকাণ্ডীয় যাগযজ্ঞ অথবা জ্ঞানকাণ্ডীয় জল্পনা-কল্পনা করতে পারে না। এখানে *সধ্রীচীনঃ* শব্দটির মাধ্যমে প্রতিপন্ন হয় যে, ভক্তিই হচ্ছে সমীচীন পথ, কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড নয়। মায়াবাদীরা *সুশীলাঃ সাধবঃ* হতে

পারে, কিন্তু তারা যে প্রকৃতই পারমার্থিক মার্গে উন্নতি সাধন করছে, সেই সম্বন্ধে সন্দেহ রয়েছে, কারণ তারা ভক্তির পথ অবলম্বন করেনি। পক্ষান্তরে, যাঁরা আচার্যদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন, তাঁরা *সুশীলাঃ* ও *সাধবঃ* এবং অধিকন্তু তাঁরা *অকুতোভয়,* অর্থাৎ তাঁরা সব রকম ভয় থেকে মুক্ত। নির্ভয়ে দ্বাদশ মহাজন এবং তাঁদের পরম্পরার ধারা অনুসরণ করা উচিত এবং তার ফলে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ১৮

প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙ্মুখম্ ।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ ॥ ১৮ ॥

প্রায়শ্চিত্তানি—প্রায়শ্চিত্তের পন্থা; **চীর্ণানি**—অতি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত; **নারায়ণ-পরাঙ্মুখম্**—অভক্ত; **ন নিষ্পুনন্তি**—পবিত্র হতে পারে না; **রাজেন্দ্র**—হে রাজন্; **সুরা-কুম্ভম্**—মদের ভাণ্ড; **ইব**—সদৃশ; **আপ-গাঃ**—নদীর জল।

অনুবাদ

হে রাজন্, সুরাভাণ্ড যেমন বহু নদীর জলে ধৌত করলেও শুদ্ধ হয় না, তেমনই অতি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত প্রায়শ্চিত্তের পন্থার দ্বারা অভক্ত পবিত্র হতে পারে না।

তাৎপর্য

প্রায়শ্চিত্তের পন্থার সুযোগ গ্রহণ করতে হলে, কিছুটা অন্তত ভক্ত হওয়া উচিত। তা না হলে পবিত্র হওয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। এই শ্লোকটি থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, যারা কর্মজ্ঞাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের সুযোগ গ্রহণ করে, অথচ স্বল্প পরিমাণেও ভক্তিপরায়ণ না হয়, তা হলে কেবল সেই পন্থাগুলি অনুসরণ করার ফলে পবিত্র হতে পারে না। *প্রায়শ্চিত্তানি* শব্দটি বহুবচনাত্মক এবং তা কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড উভয়কেই বোঝাচ্ছে। নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই বলেছেন, *কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড* । এইভাবে নরোত্তম দাস ঠাকুর কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের পন্থাকে বিষের ভাণ্ডের সাথে তুলনা করেছেন। সুরা এবং বিষ উভয়েই সমান। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকটির বর্ণনা অনুসারে, যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তির পন্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট শ্রবণ করেছে কিন্তু আসক্ত হয়নি অর্থাৎ যে কৃষ্ণভক্ত নয়, সে একটি সুরার ভাণ্ডের মতো। ভগবদ্ভক্তির কিঞ্চিৎ স্পর্শ ব্যতীত সে পবিত্র হতে পারে না।

শ্লোক ১৯

সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্নিবেশিতং তদ্‌গুণরাগি যৈরিহ ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্
স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ ॥ ১৯ ॥

সকৃৎ—কেবল একবার; **মনঃ**—মন; **কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ**—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে; **নিবেশিতম্**—সর্বতোভাবে শরণাগত; **তৎ**—শ্রীকৃষ্ণের; **গুণরাগি**—গুণ, নাম, যশ, পরিকর আদির প্রতি যে কিছুটা আসক্ত; **যৈঃ**—যার দ্বারা; **ইহ**—এই জগতে; **ন**—না; **তে**—সেই ব্যক্তি; **যমম্**—যমরাজ; **পাশ-ভৃতঃ**—পাপীদের বন্ধন করার জন্য যারা পাশ বহন করে; **চ**—এবং; **তৎ**—তাঁর; **ভটান্**—আজ্ঞাবাহক; **স্বপ্নে অপি**—স্বপ্নেও; **পশ্যন্তি**—দেখে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **চীর্ণ-নিষ্কৃতাঃ**—যারা যথাযথভাবে প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি না করলেও যাঁরা অন্তত একবার তাঁর শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়েছেন এবং তাঁর নাম, রূপ, গুণ ও লীলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত, কারণ তাঁরা প্রায়শ্চিত্তের প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করেছেন। সেই শরণাগত ব্যক্তি স্বপ্নেও পাপীদের বন্ধন করার জন্য পাশ-বহনকারী যমদূতদের দর্শন করেন না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৬৬) বলেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সর্বপ্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। ভয় পেয়ো না।" এখানেও সেই একই কথা বলা হয়েছে (*সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*)। *ভগবদ্‌গীতা* পাঠ করে কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে মনস্থ করেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী যে *বাসুদেবপরায়ণ* এবং *নারায়ণপরায়ণ* শব্দ দুটি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করে অবশেষে বলেছেন *কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*, সেই

বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এইভাবে তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন নারায়ণ এবং বাসুদেব উভয়েরই উৎস। যদিও নারায়ণ এবং বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন নন, কেবল শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার ফলেই নারায়ণ, বাসুদেব, গোবিন্দ আদি তাঁর সমস্ত অবতারদের কাছেও পূর্ণরূপে শরণাগত হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/৭) বলেছেন, *মত্তঃ পরতরং নান্যৎ*—"আমার থেকে পরতর সত্য আর কিছু নেই।" ভগবানের বহু নাম এবং রূপ রয়েছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাঁর পরম রূপ (*কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*)। তাই শ্রীকৃষ্ণ নবীন ভক্তদের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন কেবল তাঁরই শরণাগত হয় (*মাম্ একম্*)। যেহেতু নবীন ভক্তেরা নারায়ণ, বাসুদেব এবং গোবিন্দের রূপ যে কি তা বুঝতে পারে না, তাই শ্রীকৃষ্ণ তাদের সরাসরি বলেছেন, *মাম্ একম্* । এখানে সেই তত্ত্বটি *কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ* শব্দটির দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে। নারায়ণ স্বয়ং কথা বলেন না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেব বলেন। তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে *ভগবদ্গীতা* । তাই, *ভগবদ্গীতার* নির্দেশ অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া এবং এই শরণাগতিই ভক্তিযোগের চরম সিদ্ধি।

পরীক্ষিৎ মহারাজ শুকদেব গোস্বামীর কাছে জিজ্ঞাসা করেছেন, কিভাবে নরক থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। এই শ্লোকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁর উত্তরে বলেছেন যে, কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তখন আর তাঁকে নরকে যেতে হয় না। সেখানে যাওয়ার কি কথা, তাঁরা স্বপ্নেও যমরাজ অথবা যারা পাপীদের নরকে নিয়ে যায়, সেই দূতদেরও দর্শন করেন না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কেউ যদি নরকে অধঃপতিত হওয়ার থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চায়, তা হলে তাকে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে হবে। এখানে *সকৃৎ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ তা ইঙ্গিত করে যে, কেউ যদি নিষ্ঠা সহকারে একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তা হলে তিনি দৈবক্রমে পাপকর্ম করলেও উদ্ধার পেয়ে যাবেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩০) বলেছেন—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥

"অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্তি সহকারে আমাকে ভজনা করেন, তাকে সাধু বলে মনে করবে, কারণ তিনি যথার্থ মার্গে অবস্থিত।" কেউ যদি ক্ষণিকের জন্যও শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে না যান, তিনি দৈবক্রমে অধঃপতিত হলেও রক্ষা পেয়ে যাবেন।

ভগবদ্গীতার (২/৪০) দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন—

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥

"ভক্তিযোগের অনুশীলন কখনও ব্যর্থ হয় না এবং তার কোনও ক্ষয় নেই। তার স্বল্প অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠাতাকে সংসাররূপ মহাভয় থেকে পরিত্রাণ করে।"

ভগবদ্গীতার অন্যত্র (৬/৪০) ভগবান বলেছেন, *ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি*—"যিনি কল্যাণকর কার্য অনুষ্ঠান করেন, তাঁর কখনও কোন রকম দুর্গতি হয় না।" সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণকর কার্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগতি। সেটিই হচ্ছে একমাত্র পন্থা, যার দ্বারা নরক থেকে উদ্ধার লাভ করা যায়। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলেছেন—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে ।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়েছেন, তাঁর পাপকর্মকে বিষদন্তহীন সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে (*প্রোৎখাতদ্রংষ্ট্রায়তে*)। সেই সাপের থেকে আর কোনও ভয় থাকে না। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার অছিলায় পাপকর্ম করা উচিত নয়। কিন্তু, শরণাগত ব্যক্তি যদি কখনও পূর্বের অভ্যাসবশত পাপকর্ম করে ফেলে, তা হলে সেই পাপকর্মের ফল তাঁর ভক্তিকে নষ্ট করে দেবে না। তাই দৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম আঁকড়ে ধরে থাকা উচিত এবং শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে তাঁর সেবা করা উচিত। এইভাবে সর্ব অবস্থাতেই অকুতোভয় হওয়া যায়।

শ্লোক ২০

অত্র চোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
দূতানাং বিষ্ণুযময়োঃ সংবাদস্তং নিবোধ মে ॥ ২০ ॥

অত্র—এই বিষয়ে; **চ**—ও; **উদাহরন্তি**—একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়; **ইমম্**—এই; **ইতিহাসম্**—ইতিহাস (অজামিলের); **পুরাতনম্**—অতি প্রাচীন; **দূতানাম্**—দূতদের; **বিষ্ণু**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **যময়োঃ**—এবং যমরাজের; **সংবাদঃ**—আলোচনা; **তম্**—তা; **নিবোধ**—বোঝার চেষ্টা করুন; **মে**—আমার কাছ থেকে।

অনুবাদ

এই বিষয়ে পণ্ডিত এবং মহাত্মারা একটি পুরাতন ইতিহাস দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ণনা করেন। বিষ্ণুদূত ও যমদূতের আলোচনা সমন্বিত সেই ঘটনাটি আপনি আমার কাছে শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

মূর্খ মানুষেরা অনেক সময় *পুরাণ* বা প্রাচীন ইতিহাসকে রূপকথা বলে মনে করে কোন রকম গুরুত্ব দেয় না। প্রকৃতপক্ষে *পুরাণ* বা ব্রহ্মাণ্ডের প্রাচীন ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে না হলেও তা সত্য ঘটনা। লক্ষ লক্ষ বছর আগে, কেবল এই পৃথিবীতেই নয়, ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য লোকেও যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল, তার ইতিবৃত্ত হচ্ছে *পুরাণ* । তাই বৈদিক পণ্ডিত এবং তত্ত্ববেত্তা পুরুষেরা পুরাণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উপদেশ দেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী পুরাণগুলিকে বেদের মতোই গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করেছেন। তাই *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে তিনি *ব্রহ্মযামল* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা ।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

"যে ভগবদ্ভক্তি *উপনিষদ, পুরাণ, নারদ-পঞ্চরাত্র* আদি প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রকে উপেক্ষা করে, তা কেবল সমাজে অনর্থক উৎপাতেরই সৃষ্টি করে।" কৃষ্ণভক্ত কেবল বেদই নয়, সমস্ত পুরাণগুলিও স্বীকার করেন। কখনও মূর্খতাবশত মনে করা উচিত নয় যে, পুরাণগুলি হচ্ছে কতকগুলি রূপকথা। তা যদি রূপকথা হত, তা হলে শুকদেব গোস্বামী অজামিলের উপাখ্যান বর্ণনা করতেন না। সেই ইতিহাসটি হচ্ছে এই রকম।

শ্লোক ২১

কান্যকুব্জে দ্বিজঃ কশ্চিদ্দাসীপতিরজামিলঃ ।
নাম্না নষ্টসদাচারো দাস্যাঃ সংসর্গদূষিতঃ ॥ ২১ ॥

কান্যকুব্জে—কান্যকুব্জ নগরে (কানপুরের নিকটবর্তী কনৌজে); **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **কশ্চিৎ**—কোন; **দাসীপতিঃ**—শূদ্রাণী বা বেশ্যার পতি; **অজামিলঃ**—অজামিল; **নাম্না**—নামক; **নষ্ট-সদাচারঃ**—যে তার সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী হারিয়েছিল; **দাস্যাঃ**—দাসী বা বেশ্যার; **সংসর্গ-দূষিতঃ**—সঙ্গ প্রভাবে কলুষিত।

অনুবাদ

কান্যকুব্জ নগরে অজামিল নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করত। সে এক বেশ্যা দাসীকে বিবাহ করে তার সঙ্গ প্রভাবে সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত সদ্‌গুণ হারিয়েছিল।

তাৎপর্য

অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের ফলে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী নষ্ট হয়ে যায়। ভারতবর্ষে এখনও এক শ্রেণীর সেবক রয়েছে, যাদের বলা হয় শূদ্র এবং তাদের পত্নীদের বলা হয় শূদ্রাণী। যারা অত্যন্ত কামুক, তারা এই ধরনের শূদ্রাণী এবং মেথরাণীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, কারণ সমাজের উচ্চস্তরে মেয়েদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ রয়েছে। অজামিল ছিল ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন যুবক। বেশ্যার সঙ্গ প্রভাবে সে তার সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী হারিয়ে ফেলে, কিন্তু তার জীবনের শেষ পর্যায়ে ভক্তিযোগ অনুশীলন শুরু করায় সে রক্ষা পেয়েছিল। তাই পূর্ববর্তী শ্লোকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সেই রকম মানুষের কথা বলেছেন, যে অন্তত একবার ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়েছে (*মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*) অথবা ভক্তিযোগের পন্থা অনুশীলন করতে শুরু করেছে। ভক্তিযোগ শুরু হয় *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ* থেকে, অর্থাৎ **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে,**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর এই নাম শ্রবণ এবং কীর্তন করে। কীর্তন থেকে ভক্তিযোগের শুরু হয়, তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঘোষণা করেছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"কলহ এবং প্রবঞ্চনাপূর্ণ এই কলিযুগে, ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করাই উদ্ধার লাভের একমাত্র উপায়। এ ছাড়া আর কোনও গতি নেই, আর কোনও গতি নেই, আর কোনও গতি নেই।" হরিনাম কীর্তনের প্রভাব অপূর্ব, বিশেষ করে এই কলিযুগে। তার ব্যবহারিক প্রভাব শ্রীল শুকদেব গোস্বামী অজামিলের ইতিহাসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। অজামিল ছিল এক মহাপাপী। কিন্তু নারায়ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করার ফলে সে যমদূতদের কবল থেকে মুক্ত হয়েছিল। পরীক্ষিৎ মহারাজের মূল প্রশ্নটি ছিল, কিভাবে নরক থেকে বা যমদূতদের কবল থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তার উত্তরে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই প্রাচীন ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তটির মাধ্যমে ভক্তিযোগের প্রভাব বর্ণনা করেছেন, যার শুরু হয়

ভগবানের নাম কীর্তন থেকে। ভক্তিযোগের সমস্ত মহান আচার্যেরা উপদেশ দিয়েছেন যে, কৃষ্ণনাম কীর্তনের মাধ্যমেই ভগবদ্ভক্তির পন্থা শুরু হয় (*তন্নামগ্রহণাদিভিঃ*)।

শ্লোক ২২

বন্দ্যক্ষৈঃ কৈতবৈশ্চৌর্যৈর্গর্হিতাং বৃত্তিমাস্থিতঃ ।
বিভ্রৎ কুটুম্বমশুচির্যাতয়ামাস দেহিনঃ ॥ ২২ ॥

বন্দী-অক্ষৈঃ—কাউকে অনর্থক বন্ধন করে; **কৈতবৈঃ**—দ্যূতক্রীড়ার দ্বারা প্রবঞ্চনা করে; **চৌর্যৈঃ**—চুরি করে; **গর্হিতাম্**—নিন্দিত; **বৃত্তিম্**—জীবিকা; **আস্থিতঃ**—গ্রহণ করেছিল (বেশ্যার সঙ্গ প্রভাবে); **বিভ্রৎ**—পালন করে; **কুটুম্বম্**—তার স্ত্রী-পুত্রদের; **অশুচিঃ**—মহাপাপী; **যাতয়ামাস**—সে যন্ত্রণা দিত; **দেহিনঃ**—অন্য জীবদের।

অনুবাদ

এই অধঃপতিত ব্রাহ্মণ অজামিল মানুষকে বন্দী করে, দ্যূতক্রীড়ায় প্রবঞ্চনা করে অথবা সরাসরিভাবে লুণ্ঠন করে অন্যদের কষ্ট দিত। এইভাবে সে তার স্ত্রী-পুত্রদের ভরণ-পোষণ করার জন্য জীবিকা উপার্জন করত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, কেবল বেশ্যার সঙ্গে অবৈধ যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার ফলে মানুষ কিভাবে অধঃপতিত হয়। সৎ-চরিত্রা অথবা সম্ভ্রান্ত রমণীদের সঙ্গে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ সম্ভব নয়। তা কেবল অসতী শূদ্রাণীদের সঙ্গেই সম্ভব। সমাজে বেশ্যাবৃত্তি এবং অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের যতই স্বীকৃতি দেওয়া হবে, ততই প্রতারক, চোর, ডাকাত, নেশাখোর এবং জুয়ারীদের প্রভাব বাড়বে। তাই আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে আমাদের শিষ্যদের আমরা অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করার উপদেশ দিই। কারণ এই অবৈধ স্ত্রীসঙ্গই হচ্ছে সব রকম জঘন্য কার্যকলাপের মূল। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের ফলে মানুষ ক্রমশ মাংসাহার, দ্যূতক্রীড়া এবং আসবপানে প্রবৃত্ত হয়। এই সমস্ত কর্ম থেকে নিবৃত্ত হওয়া অবশ্যই অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু কেউ যদি সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তা হলে তা সহজেই সম্ভব হয়, কারণ কৃষ্ণভক্তের কাছে এই সমস্ত জঘন্য অভ্যাসগুলি ক্রমশ অরুচিকর বলে মনে হয়। সমাজে যদি অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বৃদ্ধি পেতে দেওয়া হয়, তা হলে সমগ্র সমাজ অত্যন্ত কলুষিত হয়ে উঠবে, কারণ সমাজ তখন দস্যু, তস্কর, প্রবঞ্চক ইত্যাদিতে ভরে যাবে।

শ্লোক ২৩

এবং নিবসতস্তস্য লালয়ানস্য তৎসুতান্ ।
কালোঽত্যগান্মহান্ রাজন্নষ্টাশীত্যায়ুষঃ সমাঃ ॥ ২৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **নিবসতঃ**—জীবন যাপন করে; **তস্য**—তার (অজামিলের); **লালয়ানস্য**—লালনপালন করে; **তৎ**—তার (শূদ্রাণীর); **সুতান্**—পুত্রদের; **কালঃ**—কাল; **অত্যগাৎ**—অতিবাহিত হয়েছিল; **মহান্**—সুদীর্ঘ; **রাজন্**—হে রাজন্; **অষ্টাশীত্যা**—অষ্টাশি; **আয়ুষঃ**—আয়ু; **সমাঃ**—বৎসর।

অনুবাদ

হে রাজন্, বহু পুত্রসমন্বিত তার পরিবারের লালন-পালন করার জন্য নানা রকম জঘন্য পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে তার ৮৮ বৎসর দীর্ঘ আয়ু অতিক্রান্ত হয়েছিল।

শ্লোক ২৪

তস্য প্রবয়সঃ পুত্রা দশ তেষাং তু যোঽবমঃ ।
বালো নারায়ণো নাম্না পিত্রোশ্চ দয়িতো ভৃশম্ ॥ ২৪ ॥

তস্য—তার (অজামিলের); **প্রবয়সঃ**—অতি বৃদ্ধ; **পুত্রাঃ**—পুত্র; **দশ**—দশ; **তেষাম্**—তাদের সকলের; **তু**—কিন্তু; **যঃ**—যে; **অবমঃ**—সর্বকনিষ্ঠ; **বালঃ**—শিশু; **নারায়ণঃ**—নারায়ণ; **নাম্না**—নামক; **পিত্রোঃ**—তার পিতা-মাতার; **চ**—এবং; **দয়িতঃ**—প্রিয়; **ভৃশম্**—অত্যন্ত।

অনুবাদ

বৃদ্ধ অজামিলের দশটি পুত্র ছিল, তার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ পুত্রটির নাম ছিল নারায়ণ। যেহেতু নারায়ণ ছিল তার পুত্রদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ, তাই সে পিতা-মাতার অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

তাৎপর্য

প্রবয়সঃ শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, অজামিল কত পাপী ছিল, কারণ ৮৮ বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও তার একটি অত্যন্ত ছোট পুত্র ছিল। বৈদিক সংস্কৃতিতে ৫০ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তখন আর গৃহে থেকে সন্তান-

সন্ততি উৎপাদনের কার্যে লিপ্ত থাকা উচিত নয়। ২৫ বছর থেকে ৪৫ বছর অথবা বড় জোর ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত বৈধ পত্নীর সঙ্গ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তারপর মৈথুন আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে গৃহত্যাগ করে বানপ্রস্থ আশ্রম এবং তারপর যথাযথভাবে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা উচিত। অজামিল কিন্তু বেশ্যার সঙ্গ প্রভাবে, তথাকথিত গৃহস্থ-জীবনেই, তার সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত গুণ ও সংস্কৃতি হারিয়ে মহাপাপীতে পরিণত হয়েছিল।

শ্লোক ২৫

স বদ্ধহৃদয়স্তস্মিন্নর্ভকে কলভাষিণি ।
নিরীক্ষমাণস্তল্লীলাং মুমুদে জরঠো ভৃশম্ ॥ ২৫ ॥

সঃ—সে; **বদ্ধ-হৃদয়ঃ**—অত্যন্ত আসক্ত হয়ে; **তস্মিন্**—সেই; **অর্ভকে**—শিশুটির প্রতি; **কল-ভাষিণি**—যে আধ আধভাবে কথা বলত; **নিরীক্ষমাণঃ**—দর্শন করে; **তৎ**—তার; **লীলাম্**—শিশুসুলভ চেষ্টা (যেমন হাঁটা এবং কথা বলা); **মুমুদে**—আনন্দ উপভোগ করত; **জরঠঃ**—বৃদ্ধ; **ভৃশম্**—অত্যন্ত।

অনুবাদ

বৃদ্ধ অজামিলের চিত্ত সেই অস্ফুট মধুরভাষী শিশুটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকত। সে সর্বদা সেই শিশুটিকে নিয়ে থাকত এবং শিশুসুলভ কার্যকলাপ দেখে আনন্দিত হত।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নারায়ণ নামক অজামিলের পুত্রটি এতই ছোট ছিল যে, সে স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারত না অথবা হাঁটতে পারত না। বৃদ্ধ অজামিল সেই শিশুটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, তার শিশুসুলভ চেষ্টা দর্শন করে অত্যন্ত আনন্দিত হত, এবং যেহেতু সেই শিশুটির নাম ছিল নারায়ণ, তাই সেই বৃদ্ধ সর্বদা নারায়ণের নাম উচ্চারণ করত। যদিও সে ভগবান নারায়ণকে না ডেকে সেই শিশুটিকে সম্বোধন করে সেই নাম উচ্চারণ করত, তবুও নারায়ণ নাম এতই শক্তিশালী যে, তার ফলেই সে পবিত্র হয়ে গিয়েছিল (*হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্*)। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাই ঘোষণা করেছেন যে, কারও মন যদি কোন না কোন ক্রমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামের

প্রতি আকৃষ্ট হয় (*তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ*), তা হলে সে মুক্তির পথে অগ্রসর হবে। তাই হিন্দু সমাজে কৃষ্ণদাস, গোবিন্দ দাস, নারায়ণ দাস, বৃন্দাবন দাস ইত্যাদি নামকরণের প্রথা রয়েছে। তার ফলে কৃষ্ণ, গোবিন্দ, নারায়ণ এবং বৃন্দাবনের নাম কীর্তন করার মাধ্যমে পবিত্র হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

শ্লোক ২৬

ভুঞ্জানঃ প্রপিবন্ খাদন্ বালকং স্নেহযন্ত্রিতঃ ।
ভোজয়ন্ পায়য়ন্ মূঢ়ো ন বেদাগতমন্তকম্ ॥ ২৬ ॥

ভুঞ্জানঃ—আহার করার সময়; **প্রপিবন্**—পান করার সময়; **খাদন্**—চর্বণ করার সময়; **বালকম্**—শিশুটিকে; **স্নেহ-যন্ত্রিতঃ**—স্নেহাসক্ত হয়ে; **ভোজয়ন্**—খাওয়াত; **পায়য়ন্**—পান করাত; **মূঢ়ঃ**—মূর্খ ব্যক্তিটি; **ন**—না; **বেদ**—বুঝতে পেরে; **আগতম্**—উপস্থিত হয়েছে; **অন্তকম্**—মৃত্যু।

অনুবাদ

অজামিল নিজে যখন কোন কিছু আহার করত, অথবা পান করত, তখন সে সেই শিশুটিকেও ভোজন করাত এবং পান করাত। এইভাবে শিশুটির লালন-পালন করে এবং তার নারায়ণ নাম উচ্চারণ করে অজামিল সর্বদা ব্যস্ত থাকত এবং সে বুঝতে পারেনি যে, এখন তার আয়ু সমাপ্ত হয়ে মৃত্যু আসন্ন হয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবান বদ্ধ জীবদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ। অজামিল সম্পূর্ণভাবে নারায়ণকে ভুলে গেলেও, সে যখন তার শিশুটিকে ডাকত, "নারায়ণ, এখানে এসে এই খাবারটি খাও। নারায়ণ, এই দুধটি খেয়ে নাও।" তখন সে কোন না কোনভাবে নারায়ণের নামের প্রতি আসক্ত হচ্ছিল। একে বলা হয় *অজ্ঞাত-সুকৃতি*। তার পুত্রের নাম ধরে ডাকলেও অজ্ঞাতসারে সে নারায়ণের নাম উচ্চারণ করছিল, এবং ভগবানের দিব্য নামের এমনই চিন্ময় প্রভাব যে, তার সেই নামের হিসাব রাখা হচ্ছিল।

শ্লোক ২৭

স এবং বর্তমানোঽজ্ঞো মৃত্যুকাল উপস্থিতে ।
মতিং চকার তনয়ে বালে নারায়ণাহ্বয়ে ॥ ২৭ ॥

সঃ—সেই অজামিল; **এবম্**—এইভাবে; **বর্তমানঃ**—জীবন যাপন করে; **অজ্ঞঃ**—মূর্খ; **মৃত্যু-কালে**—মৃত্যুর সময়; **উপস্থিতে**—উপস্থিত হয়েছিল; **মতিম্ চকার**—তার মনকে একাগ্র করেছিল; **তনয়ে**—তার পুত্রের প্রতি; **বালে**—শিশু; **নারায়ণ-আহ্বয়ে**—যার নাম ছিল নারায়ণ।

অনুবাদ

যখন মূর্খ অজামিলের মৃত্যুকাল উপস্থিত হল, তখন সে কেবল তার পুত্র নারায়ণের কথা চিন্তা করতে লাগল।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে (২/১/৬) শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছেন—

এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্মপরিনিষ্ঠয়া ।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ ॥

"জড় এবং চেতন সম্বন্ধীয় যথাযথ জ্ঞান লাভের পন্থা বা সাংখ্যজ্ঞান, যোগ অনুশীলন অথবা যথাযথভাবে বর্ণাশ্রম অনুশীলন—এই সব কয়টি পন্থারই পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তিম সময়ে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করা।" জ্ঞাতসারে হোক অথবা অজ্ঞাতসারে হোক, কোন না কোন ক্রমে অজামিল তার মৃত্যুর সময় নারায়ণের নাম উচ্চারণ করেছিল (*অন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ*), এবং তাই সে কেবল নারায়ণের নামে তার মনকে একাগ্র করার ফলে সর্বসিদ্ধি লাভ করেছিল।

তা থেকে এই সিদ্ধান্তও করা যায় যে, ব্রাহ্মণ সন্তান অজামিল তার যৌবনে নারায়ণের পূজা করত, কারণ প্রতিটি ব্রাহ্মণের গৃহে নারায়ণ-শিলার পূজা হয়। সেই প্রথা ভারতবর্ষে এখনও প্রচলিত রয়েছে; নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণদের গৃহে নিয়মিতভাবে নারায়ণ সেবা হয়। তাই, অধঃপতিত হওয়া সত্ত্বেও তার পুত্রের নাম ধরে ডাকার ফলে যে নারায়ণকে তিনি তার যৌবনে নিষ্ঠাভরে আরাধনা করেছিলেন, তাঁকে স্মরণ হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলেছেন—*এতচ্চ তদুপলালনাদি-শ্রীনারায়ণ-নামোচ্চারণমাহাত্ম্যেন তদ্ভক্তিরেবাভূদিতি সিদ্ধান্তোপযোগিত্বেনাপি দ্রষ্টব্যম্* । "ভক্তি-সিদ্ধান্ত অনুসারে বিচার করতে হবে যে, অজামিল যেহেতু নিরন্তর তার পুত্রের নাম নারায়ণ উচ্চারণ করেছিল, তাই সে অজ্ঞাতসারে হলেও ভক্তির স্তরে উন্নীত হয়, যদিও সে তা জানত না।" তেমনই, শ্রীল বীররাঘব আচার্য বলেছেন—*এবং বর্তমানঃ স দ্বিজঃ মৃত্যুকালে উপস্থিতে সত্যজ্ঞো নারায়ণাখ্যে পুত্র এব মতিং চকার*

মতিম্ আসক্তম্ অকরোদ্ ইত্যর্থঃ । "মৃত্যুর সময় যদিও সে তার পুত্রকে ডাকছিল, তবুও তার মন দিব্য নারায়ণ নামে একাগ্রীভূত হয়েছিল।" শ্রীল বিজয়ধ্বজ তীর্থও সেই মতই প্রকাশ করেছেন—

মৃত্যুকালে দেহবিয়োগলক্ষণকালে মৃত্যোঃ সর্বদোষপাপহরস্য হরেরনুগ্রহাৎ কালে দত্তজ্ঞানলক্ষণে উপস্থিতে হৃদি প্রকাশিতে তনয়ে পূর্ণজ্ঞানে বালে পঞ্চবর্ষকল্পে প্রাদেশমাত্রে নারায়ণাহ্বয়ে মূর্তিবিশেষে মতিং স্মরণসমর্থং চিত্তং চকার ভক্তাস্মরদ্ ইত্যর্থঃ ।

প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে অজামিল তার মৃত্যুর সময়ে নারায়ণকে স্মরণ করেছিল (*অন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ*)।

শ্লোক ২৮-২৯

স পাশহস্তাংস্ত্রীন্ দৃষ্ট্বা পুরুষানতিদারুণান্ ।
বক্রতুণ্ডানূর্ধ্বরোম্ন আত্মানং নেতুমাগতান্ ॥ ২৮ ॥
দূরে ক্রীড়নকাসক্তং পুত্রং নারায়ণাহ্বয়ম্ ।
প্লাবিতেন স্বরেণোচ্চৈরাজুহাবাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৯ ॥

সঃ—সেই ব্যক্তি (অজামিল); **পাশ-হস্তান্**—তাদের হাতে দড়ি; **ত্রীন্**—তিন; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **পুরুষান্**—ব্যক্তিদের; **অতি-দারুণান্**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দর্শন; **বক্র-তুণ্ডান্**—তাদের মুখ বক্র; **ঊর্ধ্ব-রোম্নঃ**—ঊর্ধ্বরোমা; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **নেতুম্**—নিয়ে যাওয়ার জন্য; **আগতান্**—উপস্থিত; **দূরে**—কিছু দূরে; **ক্রীড়নক-আসক্তম্**—খেলায় মগ্ন; **পুত্রম্**—তার পুত্রকে; **নারায়ণ-আহ্বয়ম্**—নারায়ণ নামক; **প্লাবিতেন**—অশ্রুপূর্ণ নয়নে; **স্বরেণ**—স্বরে; **উচ্চৈঃ**—অতি উচ্চস্বরে; **আজুহাব**—ডেকেছিল; **আকুল-ইন্দ্রিয়ঃ**—ব্যাকুলভাবে।

অনুবাদ

অজামিল তখন দেখতে পেল যে, তিনজন পাশহস্ত, বক্রমুখ, ঊর্ধ্বরোমা, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দর্শন পুরুষ তাকে যমালয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছে। তাদের দেখে অজামিল অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়েছিল এবং কিছু দূরে খেলায় মগ্ন তার পুত্রটির প্রতি আসক্তিবশত অজামিল উচ্চস্বরে তার নাম ধরে ডাকতে শুরু করে। এইভাবে অশ্রুপূর্ণ নয়নে সে নারায়ণের নাম উচ্চারণ করেছিল।

তাৎপর্য

মানুষ তার দেহ, মন এবং বাক্যের দ্বারা পাপকর্ম করে। তাই অজামিলকে যমালয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনজন যমদূত এসেছিল। সৌভাগ্যক্রমে, তার পুত্রের নাম ধরে ডাকলেও অজামিল চারবর্ণ সমন্বিত *হরিনাম* নারায়ণ উচ্চারণ করেছিল এবং তার ফলে নারায়ণের দূত অর্থাৎ বিষ্ণুদূতেরা তৎক্ষণাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। যেহেতু অজামিল যমপাশের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়েছিল, তাই সে অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভগবানের নাম উচ্চারণ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, সে নারায়ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করতে চায়নি; সে কেবল তার পুত্রকে ডেকেছিল।

শ্লোক ৩০

নিশম্য ম্রিয়মাণস্য মুখতো হরিকীর্তনম্ ।
ভর্তুর্নাম মহারাজ পার্ষদাঃ সহসাপতন্ ॥ ৩০ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; **ম্রিয়মাণস্য**—মরণোন্মুখ মানুষের; **মুখতঃ**—মুখ থেকে; **হরি-কীর্তনম্**—ভগবানের নাম কীর্তন; **ভর্তুঃ নাম**—তাদের প্রভুর দিব্য নাম; **মহারাজ**—হে রাজন্; **পার্ষদাঃ**—বিষ্ণুদূতেরা; **সহসা**—তৎক্ষণাৎ; **আপতন্**—উপস্থিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে রাজন্, বিষ্ণুদূতেরা মরণোন্মুখ অজামিলের মুখ থেকে তাঁদের প্রভুর দিব্য নাম শ্রবণ করে তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। অজামিল নিশ্চয় নিরপরাধে সেই নাম উচ্চারণ করেছিল, কারণ সে অত্যন্ত ভয়ার্ত হয়ে সেই নাম করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন, *হরিকীর্তনং নিশম্যাপতন্, কথম্ভূতস্য ভর্তুর্নাম ব্রুবতঃ*—বিষ্ণুদূতেরা সেখানে এসেছিলেন কারণ অজামিল নারায়ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করেছিল। অজামিল যে কেন সেই নাম উচ্চারণ করছে, সেই কথা তাঁরা বিবেচনা করেননি। নারায়ণের নাম উচ্চারণ করার সময় অজামিল প্রকৃতপক্ষে পুত্রের কথা চিন্তা করছিল, কিন্তু যেহেতু তাঁরা অজামিলের মুখে তাঁদের প্রভুর নাম শুনতে পেয়েছিলেন, তাই বিষ্ণুদূতেরা তৎক্ষণাৎ অজামিলকে রক্ষা করার জন্য

সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে হরিকীর্তনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, লীলা এবং গুণাবলীর মহিমা কীর্তন করা। অজামিল কিন্তু ভগবানের রূপ, গুণ অথবা পরিকরের মহিমা কীর্তন করেনি, সে কেবল দিব্য নাম উচ্চারণ করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই নামকীর্তন তাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। বিষ্ণুদূতেরা তাঁদের প্রভুর নাম শ্রবণ করা মাত্রই সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিজয়ধ্বজ তীর্থ মন্তব্য করেছেন—*অনেন পুত্রস্নেহম্ অন্তরেণ প্রাচীনাদৃষ্টবলাদ্ উদ্ভূতয়া ভক্ত্যা ভগবান্নমসঙ্কীর্তনং কৃতম্ ইতি জ্ঞায়তে* । "অজামিল তার পুত্রের প্রতি অত্যন্ত আসক্তিবশত নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, যেহেতু পূর্বে সে নারায়ণের সেবা করেছিল, তাই সেই সৌভাগ্যের ফলে সে নিরপরাধে ভক্তিসহকারে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করেছিল।"

শ্লোক ৩১

বিকর্ষতোঽন্তর্হৃদয়াদ্দাসীপতিমজামিলম্ ।
যমপ্রেষ্যান্ বিষ্ণুদূতা বারয়ামাসুরোজসা ॥ ৩১ ॥

বিকর্ষতঃ—বলপূর্বক টেনে বার করছিল; **অন্তঃ হৃদয়াৎ**—হৃদয়ের মধ্যে থেকে; **দাসী-পতিম্**—বেশ্যার পতি; **অজামিলম্**—অজামিলকে; **যম-প্রেষ্যান্**—যমদূতেরা; **বিষ্ণুদূতাঃ**—বিষ্ণুদূতেরা; **বারয়াম্ আসুঃ**—নিষেধ করেছিলেন; **ওজসা**—বজ্রনির্ঘোষ স্বরে।

অনুবাদ

যমদূতেরা যখন বেশ্যাপতি অজামিলের আত্মাকে তার হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে বলপূর্বক টেনে বার করছিল, তখন বিষ্ণুদূতেরা বজ্রনির্ঘোষ স্বরে তাদের নিবারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত বৈষ্ণবদের বিষ্ণুদূতেরা সর্বদা রক্ষা করেন। অজামিল যেহেতু নারায়ণের দিব্য নাম কীর্তন করেছিলেন, তাই বিষ্ণুদূতেরা কেবলমাত্র তৎক্ষণাৎ সেখানে এসে উপস্থিতই হননি, উপরন্তু তাঁরা যমদূতদের অজামিলকে স্পর্শ করতে নিষেধ করেছিলেন। বজ্রনির্ঘোষ স্বরে তাঁরা যমদূতদের

বলেছিলেন, যদি তারা অজামিলের আত্মাকে তার হৃদয় থেকে বলপূর্বক নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তা হলে তাঁরা তাদের দণ্ড দেবেন। সমস্ত পাপীদের উপর যমদূতদের অধিকার রয়েছে, কিন্তু কেউ যদি বৈষ্ণবদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে, তা হলে বিষ্ণুদূতেরা যে কোন ব্যক্তিকে এমন কি যমরাজকে পর্যন্ত দণ্ড দিতে পারেন।

জড় বৈজ্ঞানিকেরা তাদের জড় যন্ত্রপাতির সাহায্যে আত্মা যে দেহের কোথায় রয়েছে তা খুঁজে পায় না, কিন্তু এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, আত্মা হৃদয়ের অভ্যন্তরে থাকে। হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে যমদূতেরা অজামিলের আত্মাকে টেনে বার করছিল। তেমনই আমরা জানি যে, পরমাত্মা বা ভগবান শ্রীবিষ্ণু হৃদয়ের অভ্যন্তরে বিরাজ করেন (*ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*)। *উপনিষদে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমাত্মা এবং জীবাত্মা দেহরূপ বৃক্ষে পরস্পরের প্রতি সখ্যভাবাপন্ন দুটি পাখির মতো অবস্থান করে। পরমাত্মা সখ্যভাবাপন্ন কারণ ভগবান জীবাত্মার প্রতি এতই কৃপাপরবশ যে, জীবাত্মা যখন এক দেহ থেকে অন্য দেহে দেহান্তরিত হয়, তখন ভগবানও তার সঙ্গে যান। অধিকন্তু জীবাত্মার বাসনা এবং কর্ম অনুসারে ভগবান মায়ার মাধ্যমে তার জন্য আর একটি শরীর সৃষ্টি করেন।

দেহের অভ্যন্তরে হৃদয় একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো। সেই সম্বন্ধে ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬১) বলেছেন—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।" দেহরূপ যন্ত্রের চালক হচ্ছে জীবাত্মা এবং সে তার দেহটির পরিচালক ও ঈশ্বরও, কিন্তু পরম ঈশ্বর হচ্ছেন ভগবান। মায়ার দ্বারা জীবের দেহের সৃষ্টি হয় (*কর্মণা দৈবনেত্রেণ*), এবং এই জীবনে জীবের কর্ম অনুসারে, দৈবী মায়ার অধ্যক্ষতায় আর একটি যন্ত্র তৈরি হয় (*দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া*)। উপযুক্ত সময়ে জীবের পরবর্তী শরীর নির্ধারিত হয় এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই সেই বিশেষ শরীররূপী যন্ত্রে স্থানান্তরিত হয়। এটিই হচ্ছে দেহান্তরের পন্থা। এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হওয়ার সময় যমদূতেরা আত্মাকে কোন বিশেষ নরকে নিক্ষেপ করে, যাতে সে তার পরবর্তী শরীরের অবস্থার সঙ্গে অভ্যস্ত হতে পারে।

শ্লোক ৩২

ঊচুর্নিষেধিতাস্তাংস্তে বৈবস্বতপুরঃসরাঃ ।
কে যূয়ং প্রতিষেদ্ধারো ধর্মরাজস্য শাসনম্ ॥ ৩২ ॥

ঊচুঃ—উত্তর দিয়েছিল; **নিষেধিতাঃ**—নিবারিত হয়ে; **তান্**—বিষ্ণুদূতদের; **তে**—তারা; **বৈবস্বত**—যমরাজের; **পুরঃ-সরাঃ**—দূত; **কে**—কে; **যূয়ম্**—আপনারা সকলে; **প্রতিষেদ্ধারঃ**—নিষেধ করছেন; **ধর্ম-রাজস্য**—ধর্মরাজ, যমরাজের; **শাসনম্**—শাসনাধিকার।

অনুবাদ

সূর্যপুত্র যমরাজের দূতেরা এইভাবে নিবারিত হয়ে উত্তর দিয়েছিল, "যমরাজের শাসনের প্রতিষেধ করার দুঃসাহসকারী আপনারা কারা ?"

তাৎপর্য

অজামিল তার পাপকর্ম অনুসারে যমরাজের শাসনাধিকারে ছিল, কারণ জীবের পাপকর্মের পরম বিচারকরূপে যমরাজ নিযুক্ত হয়েছেন। অজামিলকে স্পর্শ করতে নিষেধ করা হলে যমদূতেরা বিস্মিত হয়েছিল, কারণ তাদের কর্তব্য সম্পাদনে ত্রিভুবনে কেউ কখনও তাদের বাধা দেয়নি।

শ্লোক ৩৩

কস্য বা কুত আয়াতাঃ কস্মাদস্য নিষেধথ ।
কিং দেবা উপদেবা যা যূয়ং কিং সিদ্ধসত্তমাঃ ॥ ৩৩ ॥

কস্য—কার সেবক; **বা**—অথবা; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **আয়াতাঃ**—আপনারা এসেছেন; **কস্মাৎ**—কি কারণে; **অস্য**—এই অজামিলের (নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে); **নিষেধথ**—নিষেধ করছেন; **কিম্**—কি; **দেবাঃ**—দেবতা; **উপদেবাঃ**—উপদেবতা; **যাঃ**—যে; **যূয়ম্**—আপনারা; **কিম্**—কি; **সিদ্ধসত্তমাঃ**—সিদ্ধ জীবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শুদ্ধ ভক্ত।

অনুবাদ

আপনারা কার সেবক? কোথা থেকে আপনারা এসেছেন? এবং কেন আপনারা আমাদের অজামিলকে স্পর্শ করতে বাধা দিচ্ছেন? আপনারা কি দেবতা, উপদেবতা অথবা শ্রেষ্ঠ ভক্ত?

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শব্দটি হচ্ছে *সিদ্ধসত্তমাঃ,* যার অর্থ হচ্ছে 'সিদ্ধদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ'। *ভগবদ্গীতায়* (৭/৩) বলা হয়েছে, *মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে*—কোটি কোটি মানুষদের মধ্যে কদাচিৎ একজন সিদ্ধিলাভের বা আত্ম-উপলব্ধির চেষ্টা করে। সিদ্ধ তিনি যিনি জানেন যে, তাঁর দেহটি তাঁর স্বরূপ নয়, তাঁর স্বরূপে তিনি চিন্ময় আত্মা (*অহং ব্রহ্মাস্মি*)। বর্তমান সময়ে কেউই প্রায় সেই কথা জানে না, কিন্তু যিনি তা উপলব্ধি করেছেন, তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাই তাকে বলা হয় *সিদ্ধ।* কেউ যখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, আত্মা হচ্ছে পরমাত্মার বিভিন্ন অংশ এবং তাই তিনি যখন পরমাত্মার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি *সিদ্ধসত্তম* হন। তখন তিনি বৈকুণ্ঠলোক বা কৃষ্ণলোকে বাস করার যোগ্য হন। তাই *সিদ্ধসত্তম* শব্দটি মুক্ত শুদ্ধ ভক্তদের সূচিত করে।

যেহেতু যমদূতেরা যমরাজের সেবক এবং যমরাজ হচ্ছেন একজন সিদ্ধসত্তম, তাই তারা জানে যে, সিদ্ধসত্তম সমস্ত উপদেবতা, দেবতা এমন কি এই জড় জগতের সমস্ত জীবদের ঊর্ধ্বে। যমদূতেরা বিষ্ণুদূতদের প্রশ্ন করেছিলেন, যেখানে একজন পাপীর মৃত্যু হচ্ছে, সেখানে কেন তাঁরা উপস্থিত হয়েছেন।

এখানে দ্রষ্টব্য যে, অজামিলের তখনও মৃত্যু হয়নি, কারণ যমদূতেরা তার আত্মাকে তার হৃদয় থেকে টেনে বার করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। তারা তার আত্মাকে নিয়ে যেতে পারেনি এবং তাই অজামিলের তখনও মৃত্যু হয়নি। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে প্রকাশিত হবে। যখন যমদূতদের সঙ্গে বিষ্ণুদূতদের তর্ক-বিতর্ক হচ্ছিল, তখন অজামিল অচেতন অবস্থায় ছিল। অজামিলের আত্মার উপরে কার অধিকার রয়েছে তা নিয়ে তাদের মধ্যে সেই তর্ক-বিতর্ক হচ্ছিল।

শ্লোক ৩৪-৩৬

সর্বে পদ্মপলাশাক্ষাঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ ।
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো লসৎপুষ্করমালিনঃ ॥ ৩৪ ॥
সর্বে চ নূত্নবয়সঃ সর্বে চারুচতুর্ভুজাঃ ।
ধনুর্নিষঙ্গাসিগদাশঙ্খচক্রাম্বুজশ্রিয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
দিশো বিতিমিরালোকাঃ কুর্বন্তঃ স্বেন তেজসা ।
কিমর্থং ধর্মপালস্য কিঙ্করান্নো নিষেধথ ॥ ৩৬ ॥

সর্বে—আপনারা সকলে; **পদ্ম-পলাশ-অক্ষাঃ**—পদ্মপলাশলোচন; **পীত**—হলুদ; **কৌশেয়**—রেশম; **বাসসঃ**—বসন পরিহিত; **কিরীটিনঃ**—মুকুটশোভিত; **কুণ্ডলিনঃ**—কর্ণে কুণ্ডল; **লসৎ**—উজ্জ্বল; **পুষ্কর-মালিনঃ**—পদ্মফুলের মালায় শোভিত; **সর্বে**—আপনারা সকলে; **চ**—ও; **নূত্ন-বয়সঃ**—নবযৌবন-সম্পন্ন; **সর্বে**—আপনারা সকলে; **চারু**—অত্যন্ত সুন্দর; **চতুঃ-ভুজাঃ**—চতুর্ভুজ; **ধনুঃ**—ধনুক; **নিষঙ্গ**—তূণ; **অসি**—তলোয়ার; **গদা**—গদা; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **চক্র**—চক্র; **অম্বুজ**—পদ্মফুল; **শ্রিয়ঃ**—শোভিত; **দিশঃ**—সর্বদিক; **বিতিমির**—অন্ধকার-বিহীন; **আলোকাঃ**—অসাধারণ জ্যোতি; **কুর্বন্তঃ**—প্রদর্শন করে; **স্বেন**—নিজেদের; **তেজসা**—জ্যোতির দ্বারা; **কিমর্থম্**—কি উদ্দেশ্য; **ধর্ম-পালস্য**—ধর্মরক্ষক যমরাজের; **কিঙ্করান্**—সেবক; **নঃ**—আমাদের; **নিষেধথ**—আপনারা নিষেধ করছেন।

অনুবাদ

যমদূতেরা বলল, আপনাদের নয়ন পদ্মফুলের পাপড়ির মতো বিস্ফারিত। আপনারা পীত কৌশেয় বসনধারী, আপনাদের সকলের মাথাতেই কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, গলদেশে পদ্মফুলের মালা শোভা পাচ্ছে, এবং আপনারা সকলেই নবযৌবন-সম্পন্ন। আপনাদের দীর্ঘ চতুর্ভুজ ধনুক, তূণ, অসি, গদা, শঙ্খ, চক্র ও পদ্মের দ্বারা অলঙ্কৃত। আপনাদের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা এক অপূর্ব জ্যোতির দ্বারা এই স্থানের অন্ধকার দূর করেছে। আপনারা কেন আমাদের বাধা দিচ্ছেন?

তাৎপর্য

কোন বিদেশির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্বে তার বেশভূষা, দৈহিক গঠন এবং আচার-আচরণের মাধ্যমে তার সম্বন্ধে একটি ধারণা জন্মায় এবং তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই যমদূতেরা যখন বিষ্ণুদূতদের প্রথম দেখেছিল, তখন তারা বিস্মিত হয়েছিল। তারা বলেছিল, "আপনাদের দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে, আপনারা অত্যন্ত উচ্চ স্তরের ব্যক্তি, এবং আপনাদের এমনই দিব্য শক্তি রয়েছে যে, আপনাদের দেহের জ্যোতির দ্বারা আপনারা এই জড় জগতের অন্ধকার দূর করেছেন। তা হলে কেন আপনারা আমাদের কর্তব্য সম্পাদনে বাধা দিচ্ছেন?" পরে বিশ্লেষণ করা হবে যে, যমদূতেরা ভুল করে অজামিলকে পাপী বলে মনে করেছিল। তারা জানত না যে, সারা জীবন পাপকর্ম করলেও নারায়ণের নাম উচ্চারণ করার ফলে সে পবিত্র হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, বৈষ্ণব না হলে বৈষ্ণবের কার্যকলাপ বোঝা যায় না।

এই শ্লোক কয়টিতে বৈকুণ্ঠবাসীদের বেশভূষা এবং দৈহিক গঠনের যথাযথ বর্ণনা করা হয়েছে। বৈকুণ্ঠবাসীদের পরনে থাকে পীত রেশমের বসন, গলায় ফুলমালা এবং তাঁদের চার হাতে তাঁরা চারটি অস্ত্র ধারণ করেন। এইভাবে তাঁদের রূপ ভগবান শ্রীবিষ্ণুরই মতো। তাঁদের রূপ নারায়ণের মতো কারণ তাঁরা সারূপ্য মুক্তি লাভ করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা নারায়ণের সেবকরূপেই আচরণ করেন। সমস্ত বৈকুণ্ঠবাসীরা পূর্ণরূপে অবগত যে, নারায়ণ বা কৃষ্ণ হচ্ছেন তাঁদের প্রভু এবং তাঁরা সকলেই তাঁর ভৃত্য। তাঁরা সকলেই স্বরূপসিদ্ধ, নিত্যমুক্ত জীব। যদিও তাঁরা নিজেদের নারায়ণ বা বিষ্ণু বলে ঘোষণা করতে পারেন, তবুও তাঁরা কখনও তা করেন না; তাঁরা সর্বদাই কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ হয়ে ভগবানের সেবা করেন। বৈকুণ্ঠের পরিবেশ এমনই। তেমনই, যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার শিক্ষা লাভ করেন, তাঁরা সর্বদাই বৈকুণ্ঠলোকে বিরাজ করেন এবং এই জড় জগতে তাঁদের করণীয় কিছু থাকে না।

শ্লোক ৩৭

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তে যমদূতৈস্তেবাসুদেবোক্তকারিণঃ ।
তান্ প্রত্যূচুঃ প্রহস্যেদং মেঘনির্হ্রাদয়া গিরা ॥ ৩৭ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উক্তে**—সম্বোধিত হয়ে; **যমদূতৈঃ**—যমদূতদের দ্বারা; **তে**—তাঁরা; **বাসুদেব-উক্ত-কারিণঃ**—যাঁরা সর্বদা ভগবান বাসুদেবের আদেশ পালনে তৎপর (ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদ হওয়ার ফলে যাঁরা সালোক্য মুক্তি লাভ করেছেন); **তান্**—তাদের; **প্রত্যূচুঃ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **প্রহস্য**—হেসে; **ইদম্**—এই; **মেঘনির্হ্রাদয়া**—মেঘের মতো গম্ভীর; **গিরা**—স্বরে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—যমদূতেরা এইভাবে বললে, বাসুদেবের সেবকেরা হেসে জলদগম্ভীর স্বরে এই কথাগুলি বললেন।

তাৎপর্য

বিষ্ণুদূতেরা অত্যন্ত বিনম্র হওয়া সত্ত্বেও যমরাজের শাসনে বাধা দিচ্ছে দেখে যমদূতেরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিল। তেমনই যমদূতেরা সমস্ত ধর্মনীতির প্রধান

বিচারক যমরাজের সেবক হওয়ার দাবি করা সত্ত্বেও যে তারা ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত নয়, তা দেখে বিষ্ণুদূতেরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন। তাই বিষ্ণুদূতেরা এই কথা ভেবে হেসেছিলেন, "এরা অর্থহীন কি সমস্ত কথা বলছে? এরা যদি সত্যি সত্যি যমরাজের সেবক হয়, তা হলে তাদের জানা উচিত যে, অজামিলকে নিয়ে যাওয়ার অধিকার তাদের নেই।"

শ্লোক ৩৮

শ্রীবিষ্ণুদূতা ঊচুঃ
যূয়ং বৈ ধর্মরাজস্য যদি নির্দেশকারিণঃ ।
ব্রূত ধর্মস্য নস্তত্ত্বং যচ্চাধর্মস্য লক্ষণম্ ॥ ৩৮ ॥

শ্রী-বিষ্ণুদূতাঃ ঊচুঃ—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দূতেরা বললেন; **যূয়ম্**—তোমরা সকলে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ধর্ম-রাজস্য**—ধর্মতত্ত্ববেত্তা যমরাজের; **যদি**—যদি; **নির্দেশ-কারিণঃ**—আজ্ঞা পালনকারী; **ব্রূত**—বল; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **নঃ**—আমাদের; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **যৎ**—যা; **চ**—ও; **অধর্মস্য**—অধর্মের; **লক্ষণম্**—লক্ষণ।

অনুবাদ

বিষ্ণুদূতেরা বললেন—তোমরা যদি সত্যিই যমরাজের সেবক হও, তা হলে আমাদের কাছে ধর্মের স্বরূপ এবং অধর্মের লক্ষণ বল।"

তাৎপর্য

যমদূতদের কাছে বিষ্ণুদূতদের এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভৃত্যের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে প্রভুর নির্দেশ জানা। যমদূতেরা নিজেদের যমরাজের আজ্ঞাবাহক বলে দাবি করেছিল এবং তাই বিষ্ণুদূতেরা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন ধর্মের স্বরূপ, অধর্মের লক্ষণ বিশ্লেষণ করতে। বৈষ্ণব এই তত্ত্ব খুব ভালভাবে জানেন কারণ তিনি ভগবানের নির্দেশ ভালভাবে অবগত। ভগবান বলেছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" তাই ভগবানের শরণাগত হওয়াই হচ্ছে ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব। যারা শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্তে জড়া প্রকৃতির শরণাগত হয়েছে, তাদের জড়-জাগতিক স্থিতি যাই হোক না কেন তারা সকলেই পাপী। ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ হওয়ার ফলে তারা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয় না, এবং তাই তাদের দুষ্কৃতকারী

পাপী, নরাধম এবং জ্ঞানহীন মূর্খ বলে বিবেচনা করা হয়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৫) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

"মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবাপন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা আমার শরণাগত হয় না।" যারা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়নি তারা প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব জানে না; তা না হলে তারা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হত।

বিষ্ণুদূতদের প্রশ্নগুলি অত্যন্ত উপযুক্ত। কেউ যখন কারও প্রতিনিধিত্ব করে, তখন সেই ব্যক্তির উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে অবগত হওয়া তার অবশ্য কর্তব্য। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে ভক্তদের পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া উচিত; তা না হলে তাদের মূঢ় বলে বিবেচনা করা হবে। সমস্ত ভক্তদের, বিশেষ করে প্রচারকদের কৃষ্ণভাবনামৃতের দর্শন জানা উচিত, যাতে প্রচার করার সময় তাদের লজ্জিত হতে না হয় এবং অপমানিত হতে না হয়।

শ্লোক ৩৯

কথংস্বিদ্ ধ্রিয়তে দণ্ডঃ কিং বাস্য স্থানমীপ্সিতম্ ।
দণ্ড্যাঃ কিং কারিণঃ সর্বে আহোস্বিৎকতিচিন্নৃণাম্ ॥ ৩৯ ॥

কথম্ স্বিৎ—কি উপায়ে; **ধ্রিয়তে**—প্রদান করা হয়; **দণ্ডঃ**—দণ্ড; **কিম্**—কি; **বা**—অথবা; **অস্য**—এর; **স্থানম্**—স্থান; **ঈপ্সিতম্**—বাঞ্ছিত; **দণ্ড্যাঃ**—দণ্ডদানের যোগ্য; **কিম্**—কি; **কারিণঃ**—কর্মকর্তা; **সর্বে**—সমস্ত; **আহো স্বিৎ**—অথবা কি; **কতিচিৎ**—কিছু; **নৃণাম্**—মানুষদের।

অনুবাদ

দণ্ডদানের বিধি কি? দণ্ডের উপযুক্ত কে? সমস্ত কর্মীরাই কি দণ্ডণীয় অথবা তাদের মধ্যে কয়েকজন মাত্র?

তাৎপর্য

যাদের দণ্ড দেওয়ার অধিকার রয়েছে, সকলকেই দণ্ড দেওয়া তাদের উচিত নয়। অসংখ্য জীব রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই চিৎ-জগতে রয়েছেন এবং

তাঁরা নিত্যমুক্ত। এই সমস্ত নিত্যমুক্ত জীবদের বিচারের কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাদের মধ্যে অল্প কিছু সংখ্যক জীব অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশ এই জড় জগতে রয়েছে এবং জড় জগতে ৮৪ লক্ষ যোনিভুক্ত সেই সমস্ত জীবদের মধ্যে ৮০ লক্ষ যোনিই মনুষ্যেতর। তারা দণ্ডণীয় নয়, কারণ জড়া প্রকৃতির নিয়মে তাদের আপনা থেকেই ক্রমবিবর্তন হচ্ছে। উন্নত চেতনাসম্পন্ন মানুষেরাই দায়িত্বশীল, কিন্তু তাদের মধ্যেও সকলেই দণ্ডণীয় নয়। যারা উন্নত স্তরের পুণ্যকর্মে যুক্ত, তারা দণ্ডের অতীত। কেবল যারা পাপকর্মে লিপ্ত, তারাই দণ্ডণীয়। তাই বিষ্ণুদূতেরা বিশেষভাবে প্রশ্ন করেছেন যে, কে দণ্ডণীয় ও কে দণ্ডণীয় নয় তা বিচার করার জন্য যমরাজকে কেন নিযুক্ত করা হয়েছে। কিভাবে বিচার করা হয়? দণ্ডাধিকারের মূল সিদ্ধান্ত কি? বিষ্ণুদূতেরা এই প্রশ্নগুলি উত্থাপন করেছিলেন।

শ্লোক ৪০

যমদূতা ঊচুঃ

বেদপ্রণিহিতো ধর্মো হ্যধর্মস্তদ্বিপর্যয়ঃ ।
বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূরিতি শুশ্রুম ॥ ৪০ ॥

যমদূতাঃ ঊচুঃ—যমদূতেরা বলল; **বেদ**—সাম, যজু, ঋক্ এবং অথর্ব—এই চতুর্বেদের দ্বারা; **প্রণিহিতঃ**—নির্ধারিত; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অধর্মঃ**—অধর্ম; **তৎ-বিপর্যয়ঃ**—তার বিপরীত (যা বৈদিক অনুশাসন দ্বারা সমর্থিত হয়নি); **বেদঃ**—বেদ, জ্ঞানের গ্রন্থ; **নারায়ণঃ সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ নারায়ণ (নারায়ণের বাণী হওয়ার ফলে); **স্বয়ম্ভুঃ**—স্বয়ং উদ্ভূত, স্বয়ংসম্পূর্ণ (নারায়ণের নিঃশ্বাস থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে এবং অন্য কারও কাছ থেকে যা শেখা হয়নি); **ইতি**—এইভাবে; **শুশ্রুম**—আমরা শুনেছি।

অনুবাদ

যমদূতেরা উত্তর দিল—বেদে যা কিছু নির্ধারিত হয়েছে তাই ধর্ম এবং তার বিপরীত হচ্ছে অধর্ম। বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং তা স্বয়ং উদ্ভূত হয়েছে। সেই কথা আমরা যমরাজের কাছে শুনেছি।

তাৎপর্য

যমদূতেরা যথাযথভাবে উত্তর দিয়েছিল। তারা ধর্ম বা অধর্মের তত্ত্ব নিজেরা তৈরি করেনি। পক্ষান্তরে তারা বলেছিল যে, মহাজন যমরাজের কাছ থেকে তারা সেই

কথা শুনেছিল। *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ*—মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই কর্তব্য। যমরাজ দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম। তাই যমরাজের অনুচর যমদূতেরা বিষ্ণুদূতদের প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্টভাবে বলেছিল *শুশ্রুম* ("আমরা শুনেছি")। আধুনিক যুগের মানুষেরা তাদের মনগড়া ত্রুটিপূর্ণ ধর্মনীতি তৈরি করছে। সেটি ধর্ম নয়। ধর্ম এবং অধর্ম যে কি তা তারা জানে না। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে, *ধর্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র*—*বেদে* যে ধর্ম সমর্থন করা হয়নি, তা *শ্রীমদ্ভাগবত* বর্জন করেছে। ভাগবত-ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম যা ভগবান দান করেছেন। ভাগবত-ধর্ম হচ্ছে *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব স্বীকার করে তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁর বাণী অনুসরণ করা। সেটিই হচ্ছে ধর্ম। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, অর্জুন মনে করেছিলেন যে, হিংসা হচ্ছে অধর্ম এবং তাই তিনি যুদ্ধ থেকে বিরত হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যুদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করেছিলেন এবং তাই তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত ধার্মিক, কারণ শ্রীকৃষ্ণের আদেশই হচ্ছে ধর্ম। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—"সমস্ত *বেদের* বা জ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাকে জানা।" যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানেন তাঁরা মুক্ত। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।" যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে জানেন এবং তাঁর আদেশ পালন করেন, তাঁরাই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার উপযুক্ত। এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, *বেদের* নির্দেশই হচ্ছে ধর্ম এবং যা বেদবিহিত নয় তাই অধর্ম।

ধর্ম প্রকৃতপক্ষে নারায়ণও সৃষ্টি করেননি। *বেদে* বলা হয়েছে, *অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদঃ ইতি*—নারায়ণের নিঃশ্বাস থেকে ধর্ম উদ্ভূত হয়েছে। নারায়ণ নিত্য, তাঁর নিঃশ্বাসও নিত্য এবং তাই নারায়ণের নির্দেশও নিত্য বর্তমান। মধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আদি আচার্য শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

বেদানাং প্রথমো বক্তা হরিরেব যতো বিভুঃ ।
অতো বিষ্ণ্বাত্মকা বেদা ইত্যাহুর্বেদবাদিনঃ ॥

বেদের চিন্ময় বাণী ভগবানের শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। তাই বৈদিক তত্ত্ব হচ্ছে বৈষ্ণবতত্ত্ব, কারণ বিষ্ণু হচ্ছেন সমস্ত *বেদের* উৎস। *বেদে* বিষ্ণুর উপদেশ ছাড়া আর কিছু নেই এবং তাই যিনি বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেন, তিনি হচ্ছেন বৈষ্ণব। বৈষ্ণব এই জড় জগতে তৈরি কোন সংস্থার সদস্য নয়। বৈষ্ণব হচ্ছেন প্রকৃত বেদজ্ঞ, যেকথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*)।

শ্লোক ৪১

যেন স্বধাম্ন্যমী ভাবা রজঃসত্ত্বতমোময়াঃ ।
গুণনামক্রিয়ারূপৈর্বিভাব্যন্তে যথাতথম্ ॥ ৪১ ॥

যেন—যাঁর দ্বারা (নারায়ণ); **স্ব-ধাম্নি**—যদিও তাঁর ধাম চিৎ-জগতে বিরাজ করেন; **অমী**—এই সমস্ত; **ভাবাঃ**—প্রকাশ; **রজঃ-সত্ত্ব-তমঃ-ময়াঃ**—সত্ত্ব, রজ এবং তম—জড়া প্রকৃতির এই তিনটি গুণের দ্বারা সৃষ্ট; **গুণ**—গুণ; **নাম**—নাম; **ক্রিয়া**—কার্যকলাপ; **রূপৈঃ**—এবং রূপ সমন্বিত; **বিভাব্যন্তে**—বিভিন্নরূপে ব্যক্ত; **যথাতথম্**—যথাযথভাবে।

অনুবাদ

সর্বকারণের পরম কারণ নারায়ণ তাঁর ধাম চিৎ-জগতে বিরাজ করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সত্ত্ব, রজ এবং তম—জড়া প্রকৃতির এই তিনটি গুণের দ্বারা সমগ্র জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এইভাবে সমস্ত জীব বিভিন্ন গুণ, বিভিন্ন নাম (যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইত্যাদি), বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে বিভিন্ন কর্তব্য এবং বিভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। এইভাবে নারায়ণ হচ্ছেন সমগ্র জগতের কারণ।

তাৎপর্য

বেদে বলা হয়েছে—

ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥

(*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/৮)

পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ সর্বশক্তিমান। তাঁর বিবিধ শক্তি রয়েছে এবং তাই তিনি তাঁর ধামে বিরাজ করা সত্ত্বেও জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণের মিথষ্ক্রিয়ার দ্বারা সমগ্র জগৎ অনায়াসে পরিচালনা করতে পারেন এবং পালন করতে পারেন। এই মিথষ্ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন রূপ, দেহ, কার্যকলাপ এবং পরিবর্তনের সৃষ্টি হয়, এবং তা নিখুঁতভাবে সম্পাদিত হয়। ভগবান যেহেতু পূর্ণ, তাই সব কিছু এমনভাবে কার্য করেন যেন তিনি স্বয়ং সেইগুলি পর্যবেক্ষণ করছেন এবং তাতে অংশগ্রহণ করছেন। নাস্তিকেরা কিন্তু জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার ফলে, নারায়ণকে সমস্ত কার্যকলাপের পিছনে পরম কারণ বলে দর্শন করতে পারে না। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৩) বলেছেন—

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥

"তিনটি গুণের দ্বারা (সত্ত্ব, রজ ও তম) মোহিত হওয়ার ফলে সমগ্র জগৎ এই সমস্ত ভাবের অতীত এবং অব্যয় আমাকে জানতে পারে না।" মূর্খ অজ্ঞাবাদীরা যেহেতু মোহিত, জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন, তাই তারা বুঝতে পারে না যে, নারায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত কার্যকলাপের পরম কারণ। সেই সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/১) বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

"শ্রীকৃষ্ণ যিনি গোবিন্দ নামে পরিচিত, তিনিই হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা। তাঁর দেহ সচ্চিদানন্দময়। তিনি সব কিছুর আদি। তাঁর নিজের অন্য কোন উৎস নেই, কারণ তিনিই হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ।"

শ্লোক ৪২

সূর্যোঽগ্নিঃ খং মরুদ্দেবঃ সোমঃ সন্ধ্যাহনী দিশঃ ।
কং কুঃ স্বয়ং ধর্ম ইতি হ্যেতে দৈহ্যস্য সাক্ষিণঃ ॥ ৪২ ॥

সূর্যঃ—সূর্যদেব; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **খম্**—আকাশ; **মরুৎ**—বায়ু; **দেবঃ**—দেবতাগণ; **সোমঃ**—চন্দ্র; **সন্ধ্যা**—সন্ধ্যা; **অহনী**—দিন ও রাত্রি; **দিশঃ**—দিকসমূহ; **কম্**—জল; **কুঃ**—স্থল; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **ধর্মঃ**—ধর্মরাজ বা পরমাত্মা; **ইতি**—এইভাবে; **হি**—

বস্তুতপক্ষে; **এতে**—এই সমস্ত; **দৈহ্যস্য**—জড় তত্ত্বের দ্বারা রচিত শরীরে নিবাসকারী জীবাত্মা; **সাক্ষিণঃ**—সাক্ষী।

অনুবাদ

সূর্য, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, দেবতা, চন্দ্র, সন্ধ্যা, দিন, রাত্রি, দিক, জল, পৃথিবী এবং পরমাত্মা স্বয়ং জীবের সমস্ত কর্মের সাক্ষী।

তাৎপর্য

কোন কোন ধর্মাবলম্বীরা, বিশেষ করে খ্রিস্টানেরা কর্মফলে বিশ্বাস করে না। এক সময় এক খ্রিস্টান প্রফেসারের সঙ্গে আলোচনার সময় সেই ভদ্রলোক তর্ক উত্থাপন করেছিলেন যে, অপরাধীর দুষ্কর্মের সাক্ষ্য অনুসারে বিচার হয় এবং তারপর তাকে দণ্ড দেওয়া হয়, কিন্তু আমাদের পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগের জন্য সাক্ষী কোথায়? তাঁর সেই প্রশ্নের উত্তর এখানে যমদূতেরা দিয়েছে। বদ্ধ জীব মনে করে যে, সে সকলের অগোচরে তার কুকর্ম করছে এবং কেউই তার পাপকর্ম দর্শন করছে না। কিন্তু শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, সূর্য, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, চন্দ্র, দেবতা, সন্ধ্যা, দিন, রাত্রি, দিক, জল, পৃথিবী এবং প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা—এই রকম বহু সাক্ষী রয়েছেন। সাক্ষীর অভাব কোথায়? সাক্ষী ও ভগবান উভয়েই রয়েছেন এবং তাই কোন জীব উচ্চতর লোকে উন্নীত হয় এবং কোন জীব নরকাদি নিম্নতর লোকে অধঃপতিত হয়। সেই সিদ্ধান্তের কোন গরমিল নেই, কারণ ভগবানের পরিচালনায় সব কিছু নিখুঁতভাবে আয়োজিত হয়েছে (*স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ*)। এই শ্লোকে যে সমস্ত সাক্ষীর উল্লেখ করা হয়েছে, অন্য বৈদিক শাস্ত্রেও তাদের উল্লেখ করা হয়েছে—

আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ
দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে
ধর্মোঽপি জানাতি নরস্য বৃত্তম্ ॥

শ্লোক ৪৩

এতৈরধর্মো বিজ্ঞাতঃ স্থানং দণ্ডস্য যুজ্যতে ।
সর্বে কর্মানুরোধেন দণ্ডমর্হন্তি কারিণঃ ॥ ৪৩ ॥

এতৈঃ—সূর্যদেব আদি এই সমস্ত সাক্ষীদের দ্বারা; **অধর্মঃ**—ধর্মবিরোধ; **বিজ্ঞাতঃ**—জ্ঞাত; **স্থানম্**—উপযুক্ত স্থান; **দণ্ডস্য**—দণ্ডের; **যুজ্যতে**—মনে করা হয়; **সর্বে**—সমস্ত; **কর্ম-অনুরোধেন**—কর্ম অনুসারে; **দণ্ডম্**—দণ্ড; **অর্হন্তি**—যোগ্য হয়; **কারিণঃ**—পাপকর্ম অনুষ্ঠানকারী।

অনুবাদ

এই সমস্ত সাক্ষীদের দ্বারা বিজ্ঞাত অধর্ম আচরণকারীই দণ্ডের পাত্র। সকাম কর্মে লিপ্ত প্রতিটি ব্যক্তিই তাদের পাপকর্ম অনুসারে দণ্ডণীয়।

শ্লোক ৪৪

সম্ভবন্তি হি ভদ্রাণি বিপরীতানি চানঘাঃ ।
কারিণাং গুণসঙ্গোঽস্তি দেহবান্ ন হ্যকর্মকৃৎ ॥ ৪৪ ॥

সম্ভবন্তি—হয়; **হি**—বস্তুত; **ভদ্রাণি**—শুভ, পুণ্যকর্ম; **বিপরীতানি**—ঠিক তার বিপরীত (অশুভ, পাপকর্ম); **চ**—ও; **অনঘাঃ**—হে নিষ্পাপ বৈকুণ্ঠবাসী; **কারিণাম্**—কর্মীদের; **গুণ-সঙ্গঃ**—ত্রিগুণের কলুষ; **অস্তি**—হয়; **দেহবান্**—যে জড় দেহ ধারণ করেছে; **ন**—না; **হি**—বস্তুত; **অকর্ম-কৃৎ**—কর্ম অনুষ্ঠান না করে।

অনুবাদ

হে বৈকুণ্ঠবাসীগণ, আপনারা নিষ্পাপ, কিন্তু এই জড় জগতে পাপ অথবা পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানকারী সকলেই কর্মী। উভয় প্রকার কর্মই তাদের পক্ষে সম্ভব, কারণ তারা জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা কলুষিত এবং গুণের প্রভাব অনুসারে তারা কর্ম করতে বাধ্য হয়। দেহধারী জীব কখনও কর্ম না করে থাকতে পারে না এবং প্রকৃতির গুণ অনুসারে যারা কর্ম করে, তারা পাপকর্ম করতে বাধ্য। তাই এই জড় জগতে সমস্ত জীবই দণ্ডণীয়।

তাৎপর্য

মানুষ এবং মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, মানুষের বৈদিক নির্দেশ অনুসারে আচরণ করার কথা। দুর্ভাগ্যবশত, মানুষ তাদের মনগড়া, বেদবিরুদ্ধ কর্মের পন্থা উদ্ভাবন করছে। তাই তারা সকলেই পাপকর্ম করে দণ্ডণীয় হচ্ছে।

শ্লোক ৪৫

যেন যাবান্ যথাধর্মো ধর্মো বেহ সমীহিতঃ ।
স এব তৎফলং ভুঙ্‌ক্তে তথা তাবদমুত্র বৈ ॥ ৪৫ ॥

যেন—যার দ্বারা; **যাবান্**—যে পর্যন্ত; **যথা**—যেভাবে; **অধর্মঃ**—অধর্ম; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **বা**—অথবা; **ইহ**—এই জীবনে; **সমীহিতঃ**—অনুষ্ঠিত; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **এব**—বস্তুত; **তৎফলম্**—তার বিশেষ ফল; **ভুঙ্‌ক্তে**—ভোগ করে; **তথা**—সেইভাবে; **তাবৎ**—সেই পরিমাণ; **অমুত্র**—পরবর্তী জীবনে; **বৈ**—বস্তুত।

অনুবাদ

এই জীবনে যে ব্যক্তি যে পরিমাণ ও যে প্রকার ধর্ম অথবা অধর্ম আচরণ করে, পরবর্তী জীবনে সেই ব্যক্তি সেই পরিমাণ ও সেই প্রকার কর্মফল ভোগ করে।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (১৪/১৮) উল্লেখ করা হয়েছে—

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥

যারা সত্ত্বগুণে আচরণ করে, তারা স্বর্গলোকে দেবশরীর প্রাপ্ত হয়, যারা সাধারণভাবে আচরণ করে এবং অত্যধিক পাপকর্ম করে না, তারা মধ্যবর্তী লোকে থাকে এবং যারা জঘন্য পাপকর্ম করে, তারা নরকে অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ৪৬

যথেহ দেবপ্রবরাস্ত্রৈবিধ্যমুপলভ্যতে ।
ভূতেষু গুণবৈচিত্র্যাত্তথান্যত্রানুমীয়তে ॥ ৪৬ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **ইহ**—এই জীবনে; **দেব-প্রবরাঃ**—হে দেবশ্রেষ্ঠগণ; **ত্রৈ-বিধ্যম্**—তিন প্রকার বৈশিষ্ট্য; **উপলভ্যতে**—লাভ হয়; **ভূতেষু**—সমস্ত জীবের মধ্যে; **গুণ-বৈচিত্র্যাৎ**—প্রকৃতির তিন গুণের কলুষের বৈচিত্র্যের ফলে; **তথা**—তেমনই; **অন্যত্র**—অন্য স্থানে; **অনুমীয়তে**—অনুমান করা হয়।

অনুবাদ

হে দেবশ্রেষ্ঠগণ, প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাবের ফলে আমরা তিন প্রকার জীবন দেখতে পাই। তার ফলে জীবেদের শান্ত, চঞ্চল এবং মূঢ়; সুখী, অসুখী এবং তাদের মধ্যবর্তী; অথবা ধার্মিক, অধার্মিক এবং প্রায়-ধার্মিকরূপে দেখতে পাওয়া যায়। তা থেকে আমরা ঠিক করতে পারি যে, পরবর্তী জীবনেও জড়া প্রকৃতির এই তিন গুণ এইভাবে কার্য করবে।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির তিন গুণের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া আমরা এই জীবনে দেখতে পাই। যেমন কিছু লোক সুখী, কিছু লোক অত্যন্ত দুঃখী, আবার কিছু লোকের জীবন সুখ এবং দুঃখের মিশ্রণ। এগুলি পূর্ববর্তী জীবনে সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের সংসর্গের পরিণাম। যেহেতু এই জীবনে এই বৈচিত্র্যগুলি দেখা যায়, তা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, পরবর্তী জীবনেও মানুষ প্রকৃতির গুণের সংসর্গ অনুসারে সুখী, দুঃখী অথবা মিশ্র ফল ভোগ করবে। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে জড়া প্রকৃতির সঙ্গ বিবর্জিত হয়ে সর্বদা তাদের কলুষের ঊর্ধ্বে থাকা। তা সম্ভব হয় যখন কেউ পূর্ণরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়। *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) সেই কথা প্রতিপন্ন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন এবং যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন।" ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় পূর্ণরূপে মগ্ন না হলে, জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হতে হয় এবং তার ফলে দুঃখ অথবা সুখ-দুঃখের মিশ্রণ ভোগ করতে হয়।

শ্লোক ৪৭

বর্তমানোঽন্যয়োঃ কালো গুণাভিজ্ঞাপকো যথা ।
এবং জন্মান্যয়োরেতদ্ধর্মাধর্মনিদর্শনম্ ॥ ৪৭ ॥

বর্তমানঃ—বর্তমান; **অন্যয়োঃ**—অতীত এবং ভবিষ্যতের; **কালঃ**—কাল; **গুণ-অভিজ্ঞাপকঃ**—গুণগুলি জানায়; **যথা**—ঠিক যেমন; **এবম্**—এইভাবে; **জন্ম**—জন্ম;

অন্যয়োঃ—অতীত এবং ভবিষ্যৎ জন্মের; **এতৎ**—এই; **ধর্ম**—ধর্ম; **অধর্ম**—অধর্ম; **নিদর্শনম্**—নিদর্শন করে।

অনুবাদ

ঠিক যেমন বর্তমান বসন্ত ঋতু অতীতের এবং ভবিষ্যতের বসন্ত ঋতুর প্রকৃতি নির্দেশ করে, তেমনই এই জীবনের সুখ, দুঃখ অথবা তাদের মিশ্রণ পূর্ববর্তী জীবনের এবং ভবিষ্যৎ জীবনের ধর্ম এবং অধর্ম আচরণের নিদর্শন-স্বরূপ হয়।

তাৎপর্য

আমাদের অতীত এবং ভবিষ্যৎ বুঝতে পারা খুব একটা কঠিন নয়, কারণ প্রকৃতির তিন গুণের কলুষের প্রভাবে কালক্রমে আমরা ফলভোগ করি। বসন্তের আগমনে বিভিন্ন প্রকার ফুল ও ফল আপনা থেকেই প্রকাশিত হয় এবং তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, অতীতের বসন্ত ঋতুগুলিও ঠিক এইভাবে ফুলে-ফলে শোভিত ছিল এবং ভবিষ্যতেও সেইভাবেই শোভিত হবে। আমাদের জন্ম-মৃত্যুর চক্র কালের অধীনে ঘটছে এবং জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব অনুসারে আমরা বিভিন্ন প্রকার দেহ প্রাপ্ত হচ্ছি এবং বিভিন্ন অবস্থা ভোগ করছি।

শ্লোক ৪৮

মনসৈব পুরে দেবঃ পূর্বরূপং বিপশ্যতি ।
অনুমীমাংসতেঽপূর্বং মনসা ভগবানজঃ ॥ ৪৮ ॥

মনসা—মনের দ্বারা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **পুরে**—স্বীয় পুরীতে অথবা হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে; **দেবঃ**—যম দেবতা (*দিব্যতীতি দেবঃ,* যিনি সর্বদা জ্যোতির্ময় এবং উজ্জ্বল, তাঁকে বলা হয় দেব); **পূর্ব-রূপম্**—পূর্বের ধর্ম ও অধর্মের স্থিতি; **বিপশ্যতি**—পূর্ণরূপে দর্শন করে; **অনুমীমাংসতে**—তিনি বিবেচনা করেন; **অপূর্বম্**—ভবিষ্যৎ অবস্থা; **মনসা**—মনের দ্বারা; **ভগবান্**—যিনি সর্বশক্তিমান; **অজঃ**—ব্রহ্মার মতো উত্তম।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমান যমরাজ ব্রহ্মারই মতো। কারণ তাঁর নিজের ধামে অথবা পরমাত্মার মতো সকলের হৃদয়ে অবস্থান করে মনের দ্বারা তিনি জীবের পূর্বকৃত আচরণ দেখতে পান, এবং এইভাবে তিনি বুঝতে পারেন জীব ভবিষ্যতে কিভাবে আচরণ করবে।

তাৎপর্য

যমরাজকে একজন সাধারণ জীব বলে মনে করা উচিত নয়। তিনি ব্রহ্মারই মতো। সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতা করেন এবং তাই পরমাত্মার কৃপায় তিনি অন্তর থেকে জীবের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারেন। *অনুমীমাংসতে* শব্দটির অর্থ হচ্ছে তিনি পরমাত্মার সঙ্গে পরমার্শ করে বিচার করতে পারেন। অনু মানে হচ্ছে 'অনুসরণ করে'। জীবের পরবর্তী জীবন প্রকৃতপক্ষে নির্ধারিত হয় পরমাত্মার দ্বারা, এবং তা সম্পাদিত হয় যমরাজের দ্বারা।

শ্লোক ৪৯

যথাজ্ঞস্তমসা যুক্ত উপাস্তে ব্যক্তমেব হি ।
ন বেদ পূর্বমপরং নষ্টজন্মস্মৃতিস্তথা ॥ ৪৯ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **অজ্ঞঃ**—অজ্ঞ জীব; **তমসা**—নিদ্রায়; **যুক্তঃ**—অভিভূত; **উপাস্তে**—অনুসারে কার্য করে; **ব্যক্তম্**—স্বপ্নে দৃশ্যমান শরীর; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **হি**—বস্তুত; **ন বেদ**—জানে না; **পূর্বম্**—পূর্বের শরীর; **অপরম্**—পরবর্তী শরীর; **নষ্ট**—বিনষ্ট; **জন্ম-স্মৃতিঃ**—জন্মের স্মৃতি; **তথা**—তেমনই।

অনুবাদ

নিদ্রাভিভূত ব্যক্তি যেমন তার স্বপ্নদৃষ্ট শরীরকে তার নিজের স্বরূপ বলে মনে করে, ঠিক তেমনই জীব তার পূর্বকৃত পুণ্য অথবা পাপকর্ম অনুসারে প্রাপ্ত বর্তমান শরীরটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, এবং তার অতীত অথবা ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারে না।

তাৎপর্য

মানুষ তার পূর্ব জীবনের কর্ম অনুসারে, ত্রিতাপ দুঃখ জর্জরিত বর্তমান পঞ্চভৌতিক শরীরটি কিভাবে লাভ করেছে তা না জানার ফলে, সে পাপকর্মে লিপ্ত হয়। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/৫/৪) ঋষভদেব বলেছেন, *নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম*—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে উন্মত্ত ব্যক্তি পাপকর্ম করতে দ্বিধা করে না। *যদ্ ইন্দ্রিয়প্রীতয় আপৃণোতি*—সে কেবল তার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য পাপ আচরণ করে। *ন সাধু মন্যে*—তা ভাল নয়। *যত আত্মনোঽয়ম্ অসন্নপি ক্লেশদা আস দেহঃ*—এই প্রকার পাপকর্মের ফলে দুঃখভোগ করার জন্য সে আর একটি শরীর প্রাপ্ত হয়, ঠিক যেভাবে তার পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে সে তার বর্তমান শরীরে দুঃখভোগ করছে।

এখানে বুঝতে হবে যে, যার বৈদিক জ্ঞান নেই, সে পূর্বে কি করেছে, বর্তমানে কি করছে এবং ভবিষ্যতে সে কিভাবে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে, সেই সম্বন্ধে অজ্ঞতা থেকে সে আচরণ করে। সে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞানাচ্ছন্ন। তাই বৈদিক নির্দেশ হচ্ছে *তমসো মা*—"অন্ধকারে থেকো না।" *জ্যোতির্গম*—"আলোকে যাওয়ার চেষ্টা কর।" আলোক বা জ্যোতি হচ্ছে বৈদিক জ্ঞান, যা সত্ত্বগুণে উন্নীত হওয়ার ফলে বা শ্রীগুরুদেব এবং ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে সত্ত্বগুণ অতিক্রম করার দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তা *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৬/২৩) বর্ণিত হয়েছে—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

"যে মহাত্মাদের ভগবান এবং শ্রীগুরুদেবে পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে, তাঁদের কাছে বৈদিক জ্ঞান আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়।" *বেদে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুম্ এবাভিগচ্ছেৎ*—পূর্ণ বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়া উচিত এবং ভগবানের ভক্ত হওয়ার জন্য তাঁর দ্বারা শ্রদ্ধাসহকারে পরিচালিত হওয়া উচিত। তখন *বেদের* জ্ঞান প্রকাশিত হবে। বৈদিক জ্ঞান প্রকাশের ফলে, তখন আর জড়া প্রকৃতির অন্ধকারে থাকতে হয় না।

সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের সংসর্গ অনুসারে জীব বিশেষ শরীর প্রাপ্ত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, যিনি সত্ত্বগুণের সংসর্গে রয়েছেন, তিনি যোগ্য ব্রাহ্মণ। এই প্রকার ব্রাহ্মণ অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জানেন, কারণ তিনি বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ পালন করেন এবং শাস্ত্রচক্ষুর মাধ্যমে দর্শন করেন। তিনি জানেন তাঁর অতীত কি ছিল, কেন তিনি বর্তমান শরীরে রয়েছেন, এবং কিভাবে তিনি মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন যাতে তাঁকে আর কোন জড় শরীর ধারণ করতে না হয়। সত্ত্বগুণে অবস্থিত হওয়ার ফলে তা সম্ভব হয়। কিন্তু জীব সাধারণত রজ এবং তমোগুণে আচ্ছন্ন থাকে।

সে যাই হোক, পরমাত্মার বিবেচনা অনুসারে জীব নিম্ন অথবা উচ্চ স্তরের শরীর প্রাপ্ত হয়। সেই সম্বন্ধে পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে—

মনসৈব পুরে দেবঃ পূর্বরূপং বিপশ্যতি ।
অনুমীমাংসতেঽপূর্বং মনসা ভগবানজঃ ॥

সব কিছু নির্ভর করে ভগবান বা অজর উপরে। শ্রেষ্ঠতর শরীর লাভের জন্য মানুষ কেন ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করে না? তার উত্তর হচ্ছে, *অজ্ঞস্তমসা*—গভীর অজ্ঞতা। যে অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সে জানতে পারে না তার পূর্ববর্তী জীবন কি ছিল এবং তার পরবর্তী জীবন কি হবে; সে কেবল তার বর্তমান শরীরটি

নিয়েই ব্যস্ত। মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তি একটি পশুর মতো তার বর্তমান শরীর নিয়েই ব্যস্ত। পশু অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার ফলে মনে করে যে, জীবনের চরম উদ্দেশ্য এবং পরম সুখ হচ্ছে যথাসাধ্য আহার করা। মানুষের কর্তব্য তার পূর্ববর্তী জীবন সম্বন্ধে অবগত হওয়া এবং ভবিষ্যৎ জীবনকে কি করে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলা যায় সেই জন্য চেষ্টা করার শিক্ষা লাভ করা। *ভৃগুসংহিতা* নামে একটি বই রয়েছে, যাতে জ্যোতির্গণনা অনুসারে মানুষের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়। মানুষের কর্তব্য কোন না কোনভাবে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হওয়া। যে কেবল তার বর্তমান শরীর নিয়েই ব্যস্ত এবং যতখানি সম্ভব ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রচেষ্টায় রত, সে তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন বলে বুঝতে হবে। তার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন। বস্তুতপক্ষে, তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন ব্যক্তিদের ভবিষ্যৎ সর্বদাই অন্ধকারাচ্ছন্ন। বিশেষ করে এই যুগে মানব-সমাজ তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন, এবং তাই সকলেই তাদের অতীত অথবা ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা না করে তাদের বর্তমান শরীরটিকে সর্বস্ব বলে মনে করছে।

শ্লোক ৫০

পঞ্চভিঃ কুরুতে স্বার্থান্ পঞ্চ বেদাথ পঞ্চভিঃ ।
একস্তু ষোড়শেন ত্রীন্ স্বয়ং সপ্তদশোঽশ্নুতে ॥ ৫০ ॥

পঞ্চভিঃ—(বাক, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ) এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **কুরুতে**—অনুষ্ঠান করে; **স্ব-অর্থান্**—তার স্বার্থ; **পঞ্চ**—(শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ) এই পঞ্চ তন্মাত্র; **বেদ**—জানে; **অথ**—এইভাবে; **পঞ্চভিঃ**—(চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক) এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা; **একঃ**—এক; **তু**—কিন্তু; **ষোড়শেন**—এই পনেরটি বিষয় এবং মনের দ্বারা; **ত্রীন্**—তিন প্রকার অনুভূতি (সুখ, দুঃখ এবং এই দুই-এর মিশ্রণ); **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **সপ্তদশঃ**—সপ্তদশ বিষয়; **অশ্নুতে**—উপভোগ করে।

অনুবাদ

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্রের উর্ধ্বে হচ্ছে মন, যা ষোড়শ তত্ত্ব। মনের উর্ধ্বে সপ্তদশ তত্ত্ব হচ্ছে আত্মা অর্থাৎ জীব স্বয়ং, যে অন্য ষোলটির সহযোগিতায় একা জড় জগৎকে ভোগ করে। জীব সুখ, দুঃখ এবং সুখ-দুঃখের মিশ্রণ—এই তিন প্রকার পরিস্থিতি উপভোগ করে।

তাৎপর্য

সকলেই তাদের হাত, পা এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্মে লিপ্ত হয় তাদের মনগড়া ধারণা অনুসারে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা, সেই কথা না জেনে মানুষ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ এবং স্পর্শ—এই পঞ্চ তন্মাত্র উপভোগ করার চেষ্টা করে। ভগবানকে অমান্য করার ফলে জীব ভববন্ধনে জড়িয়ে পড়ে এবং ভগবানের নির্দেশ অনুসরণ না করে তার মনগড়া ধারণা অনুসারে, তার অবস্থার উন্নতিসাধন করার চেষ্টা করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি বিভ্রান্ত জীবকে তার আদেশ পালন করার মাধ্যমে কিভাবে সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়, সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্বয়ং এখানে আসেন। জীবের দেহ জড় উপাদানের এক অত্যন্ত জটিল সমন্বয় এবং সেই দেহে সে একাকী সংগ্রাম করে, যে কথা এই শ্লোকে *একঃ তু* শব্দ দুটির মাধ্যমে সূচিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, কেউ যদি সমুদ্রের মধ্যে সংগ্রাম করে, তা হলে তাকে একা সাঁতার কাটতে হয়। যদিও অন্য মানুষেরা এবং জলচর প্রাণীরা সমুদ্রে সাঁতার কাটছে, তবু তাকে একাই নিজেকে রক্ষা করতে হয়। কেউ তাকে সাহায্য করবে না। তাই এই শ্লোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সপ্তদশ তত্ত্ব, আত্মাকে একাকী কার্য করতে হয়। যদিও সে সমাজ, মৈত্রী এবং প্রীতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া কেউই তাকে সাহায্য করতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধান কি করে করা যায়, সেটিই তার একমাত্র চিন্তা হওয়া উচিত। শ্রীকৃষ্ণও তাই চান (*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং স্মরণং ব্রজ*)। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ বিভ্রান্ত মানুষেরা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু যদিও তারা মানুষ এবং জাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করে, তবুও তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সকলকেই প্রকৃতির উপাদানগুলি নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য একাই সংগ্রাম করতে হয়। তাই মানুষের একমাত্র ভরসা, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে তাঁর শরণাগত হওয়া, কারণ তিনিই কেবল ভবসাগর থেকে উদ্ধার করার জন্য সাহায্য করতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই প্রার্থনা করেছেন—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥

"হে কৃষ্ণ, হে নন্দনন্দন, আমি তোমার নিত্য দাস; কিন্তু কোন না কোন ক্রমে আমি এই ভয়ঙ্কর ভবসমুদ্রে পতিত হয়েছি, এবং বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারছি না। তাই দয়া করে তুমি আমাকে তুলে নিয়ে তোমার শ্রীপাদপদ্মে ধূলিকণা-সদৃশ স্থাপন কর। তা হলেই আমি রক্ষা পাব।"

তেমনই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—

অনাদি করম-ফলে, পড়ি' ভবার্ণব-জলে,
তরিবারে না দেখি উপায় ।

"হে ভগবান, আমি যে কিভাবে এই অজ্ঞানের সমুদ্রে পতিত হয়েছি তা মনে করতে পারছি না এবং কিভাবে যে আমি এখান থেকে উদ্ধার পেতে পারি তার কোন উপায়ও আমি দেখতে পাই না।" আমাদের মনে রাখা উচিত যে, সকলেই তার নিজের জীবনের জন্য দায়ী। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত হন, তখন তিনি অজ্ঞানের সমুদ্র থেকে উদ্ধার লাভ করেন।

শ্লোক ৫১

তদেতৎ ষোড়শকলং লিঙ্গং শক্তিত্রয়ং মহৎ ।
ধত্তেঽনুসংসৃতিং পুংসি হর্ষশোকভয়ার্তিদাম্ ॥ ৫১ ॥

তৎ—অতএব; **এতৎ**—এই; **ষোড়শ-কলম্**—ষোলটি অংশের দ্বারা রচিত (যথা দশেন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ তন্মাত্র); **লিঙ্গম্**—সূক্ষ্ম শরীর; **শক্তি-ত্রয়ম্**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাব; **মহৎ**—দুর্নিবার; **ধত্তে**—দেয়; **অনুসংসৃতিম্**—বিভিন্ন প্রকার শরীরে প্রায় নিরন্তর ভ্রমণ; **পুংসি**—জীবকে; **হর্ষ**—আনন্দ; **শোক**—শোক; **ভয়**—ভয়; **আর্তি**—দুঃখ; **দাম্**—প্রদান করে।

অনুবাদ

সূক্ষ্ম শরীর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র এবং মন—এই ষোলটি কলা-সমন্বিত। এই সূক্ষ্ম দেহটি গুণত্রয়ের প্রভাব সমন্বিত। তা দুর্নিবার বাসনাময় এবং তাই তা জীবকে মনুষ্য, পশু, দেবতা ইত্যাদি বিভিন্ন দেহে দেহান্তরিত করায়। জীব যখন দেবতার দেহ প্রাপ্ত হয়, তখন সে অবশ্যই অত্যন্ত আনন্দিত হয়। সে যখন মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়, তখন সে সর্বদাই শোক করে, এবং যখন সে পশুশরীর প্রাপ্ত হয়, তখন সে সর্বদা ভয়ভীত থাকে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, সে

সর্ব অবস্থাতেই দুঃখী। তার এই দুঃখদায়ক অবস্থাকে বলা হয় সংসৃতি বা জড় জগতে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হওয়া।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে বদ্ধ জীবনের মূল তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সপ্তদশ তত্ত্ব জীব জন্ম-জন্মান্তরে একাকী সংগ্রাম করছে। এই সংগ্রামকে বলা হয় *সংসৃতি* বা বদ্ধ জীবন। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, জড়া প্রকৃতির প্রভাব দুরতিক্রম্য (*দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া*)। জড়া প্রকৃতি বিভিন্ন শরীরে জীবকে ক্লেশ প্রদান করে, কিন্তু জীব যদি ভগবানের শরণাগত হয়, তা হলে সে এই দুঃখ-দুর্দশার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*)। এইভাবে তার জীবন সার্থক হয়।

শ্লোক ৫২

দেহ্যজ্ঞোঽজিতষড়্বর্গো নেচ্ছন্ কর্মাণি কার্যতে ।
কোশকার ইবাত্মানং কর্মণাচ্ছাদ্য মুহ্যতি ॥ ৫২ ॥

দেহী—দেহস্থ আত্মা; **অজ্ঞঃ**—প্রকৃত জ্ঞানবিহীন; **অজিত-ষট্-বর্গঃ**—যে তার ইন্দ্রিয় এবং মনকে সংযত করেনি; **ন ইচ্ছন্**—বাসনা না করে; **কর্মাণি**—জাগতিক লাভের জন্য কার্যকলাপ; **কার্যতে**—অনুষ্ঠান করায়; **কোশকারঃ**—রেশমগুটি; **ইব**—সদৃশ; **আত্মানম্**—নিজে; **কর্মণা**—সকাম কর্মের দ্বারা; **আচ্ছাদ্য**—আচ্ছাদিত করে; **মুহ্যতি**—মোহপ্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

মূর্খ জীব তার মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে না পেরে, তার ইচ্ছা না থাকলেও গুণের প্রভাব অনুসারে কার্য করতে বাধ্য হয়। তার অবস্থা ঠিক একটি রেশম-গুটিপোকার মতো, যে তার মুখনিঃসৃত লালা দিয়ে কোষ নির্মাণ করে তাতে আবদ্ধ হয় এবং তখন সে আর বেরিয়ে আসতে পারে না। জীবও তেমনই তার নিজের কর্মজালে আবদ্ধ হয়ে উদ্ধারের পথ খুঁজে পায় না। এইভাবে সে সর্বদা মোহাচ্ছন্ন থাকে এবং বার বার তার মৃত্যু হয়।

তাৎপর্য

পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। রেশম-গুটিপোকা যেমন তার গুটিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনই জীবও বিভিন্ন প্রকার সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ভগবানের সাহায্য ব্যতীত এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন।

শ্লোক ৫৩

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম গুণৈঃ স্বাভাবিকৈর্বলাৎ ॥ ৫৩ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **কশ্চিৎ**—কেউ; **ক্ষণমপি**—ক্ষণকাল; **জাতু**—কোন সময়; **তিষ্ঠতি**—থাকতে পারে; **অকর্ম-কৃৎ**—কোন কর্ম না করে; **কার্যতে**—কার্য করতে বাধ্য করে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অবশঃ**—আপনা থেকেই; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **গুণৈঃ**—তিন গুণের দ্বারা; **স্বাভাবিকৈঃ**—যা তার পূর্বজন্মের প্রবৃত্তি থেকে উৎপন্ন; **বলাৎ**—বলপূর্বক।

অনুবাদ

কোন জীবই কর্ম না করে ক্ষণকালও থাকতে পারে না। প্রকৃতির তিন গুণ অনুসারে সে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুযায়ী কোন বিশেষভাবে কর্ম করতে বাধ্য হয়।

তাৎপর্য

কর্মের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে স্বাভাবিক প্রবণতা। যেহেতু জীবাত্মা ভগবানের নিত্য দাস, তাই সেবা করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তার রয়েছে। জীব সেবা করতে চায়, কিন্তু যেহেতু সে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে গেছে, তাই সে জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে সেবা করে এবং সমাজবাদ, মানবতাবাদ, পরহিতবাদ ইত্যাদি বহু মনগড়া সেবার পন্থা উদ্ভাবন করে। কিন্তু মানুষের কর্তব্য হচ্ছে *ভগবদ্গীতার* শিক্ষা অনুসারে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া এবং ভগবানের উপদেশ অনুসারে সব রকম জড়-জাগতিক সেবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে ভগবানের সেবায় প্রবৃত্ত হওয়া। জীবের মূল স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি, কারণ তার প্রকৃত স্বরূপে সে চিন্ময়। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সে যে চিন্ময়, সেই কথা

হৃদয়ঙ্গম করে তার চিন্ময় প্রবৃত্তির অনুগমন করা এবং কখনও জড়-জাগতিক প্রবৃত্তির দ্বারা বিপথগামী না হওয়া। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাই গেয়েছেন—

(মিছে) মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে,
খাচ্ছ হাবুডুবু, ভাই।

"ভাই, তুমি মায়ার তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছ এবং কত রকম দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছ। কখনও তুমি মায়ার সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছ এবং কখনও ভেসে ওঠার জন্য সংগ্রাম করছ।" ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, এই মায়ার তরঙ্গে বিধ্বস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে জীব তখনই উদ্ধার লাভ করতে পারে, যখন সে নিজেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাসরূপে জানতে পেরে তার স্বাভাবিক চিন্ময় প্রবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত হয়।

(জীব) কৃষ্ণদাস, এই বিশ্বাস,
করলে ত' আর দুঃখ নাই।

বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত হয়ে মায়ার দাসত্ব করার পরিবর্তে, কেউ যখন তার সেবার প্রবৃত্তি ভগবানের প্রতি নিযুক্ত করে, তখন সে নিরাপদ হয় এবং তখন আর কোন দুঃখ-দুর্দশার সম্ভাবনা থাকে না। কেউ যদি বৈদিক শাস্ত্রে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া পূর্ণ জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পুনর্জাগরিত করে, তা হলে তার জীবন সার্থক হয়।

শ্লোক ৫৪

লব্ধ্বা নিমিত্তমব্যক্তং ব্যক্তাব্যক্তং ভবত্যুত ।
যথাযোনি যথাবীজং স্বভাবেন বলীয়সা ॥ ৫৪ ॥

লব্ধ্বা—লাভ করে; **নিমিত্তম্**—কারণ; **অব্যক্তম্**—জীবের অদৃষ্ট; **ব্যক্ত-অব্যক্তম্**—প্রকট এবং অপ্রকট অথবা স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীর; **ভবতি**—হয়; **উত**—নিশ্চিতভাবে; **যথা-যোনি**—মাতৃসদৃশ; **যথা-বীজম্**—পিতৃসদৃশ; **স্বভাবেন**—স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে; **বলীয়সা**—যা অত্যন্ত শক্তিশালী।

অনুবাদ

জীবের পাপ এবং পুণ্য কর্মসমূহ ফলোন্মুখ হলে তাকে বলা হয় অদৃষ্ট। সেই অদৃষ্টই জীবের জন্মের মূল কারণ। তার প্রবল কর্ম-বাসনার ফলে জীব কোন বিশেষ পরিবারে পিতৃসদৃশ অথবা মাতৃসদৃশ দেহ প্রাপ্ত হয়। তার বাসনা অনুসারে তার স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহ সৃষ্টি হয়।

তাৎপর্য

সূক্ষ্ম দেহ থেকে স্থূল দেহ উৎপন্ন হয়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৮/৬) বলা হয়েছে—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

"মৃত্যুর সময় যিনি যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেইভাবে ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন।" মৃত্যুর সময় এই স্থূল শরীরের কার্যকলাপ অনুসারে সূক্ষ্ম শরীরের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এইভাবে স্থূল শরীর জীবিত অবস্থায় কার্য করে এবং সূক্ষ্ম শরীর মৃত্যুর সময় কার্য করে। সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর বিশেষ প্রকার স্থূল শরীর বিকাশের পৃষ্ঠভূমি, এবং এই স্থূল শরীর পিতা অথবা মাতার মতো হয়। *ঋক্ বেদের* বর্ণনা অনুসারে, মৈথুনের সময় যদি মাতার স্রাব পিতার থেকে অধিক হয়, তা হলে সন্তান স্ত্রীদেহ প্রাপ্ত হয় এবং পিতার স্রাব যদি মাতার থেকে অধিক হয়, তা হলে সন্তান পুরুষ-শরীর প্রাপ্ত হয়। এইগুলি হচ্ছে প্রকৃতির সূক্ষ্ম নিয়ম যা জীবের বাসনা অনুসারে কার্য করে। কোন মানুষ যদি কৃষ্ণভক্তির বিকাশের মাধ্যমে তাঁর সূক্ষ্ম শরীরের পরিবর্তন সাধন করার শিক্ষা লাভ করেন, তা হলে মৃত্যুর সময় সূক্ষ্ম শরীর এমন একটি স্থূল শরীর সৃষ্টি করবে যাতে তিনি কৃষ্ণভক্ত হবেন, অথবা তিনি যদি আরও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, তা হলে তিনি আর অন্য কোন জড় শরীর গ্রহণ না করে তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। এটিই হচ্ছে আত্মার দেহান্তরের পন্থা। তাই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চুক্তি করে মানব-সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যর্থ চেষ্টা না করে, কিভাবে কৃষ্ণভক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়, সেই শিক্ষা প্রদান করাই বাঞ্ছনীয়। তা যেমন আজ সত্য, তেমনি চিরকালই সত্য থাকবে।

শ্লোক ৫৫

এষ প্রকৃতিসঙ্গেন পুরুষস্য বিপর্যয়ঃ ।
আসীৎ স এব ন চিরাদীশসঙ্গাদ্বিলীয়তে ॥ ৫৫ ॥

এষঃ—এই; **প্রকৃতি-সঙ্গেন**—জড়া প্রকৃতির সঙ্গের ফলে; **পুরুষস্য**—জীবের; **বিপর্যয়ঃ**—বিস্মৃতি বা জঘন্য পরিস্থিতি; **আসীৎ**—হয়েছিল; **সঃ**—সেই স্থিতি; **এব**—বস্তুত পক্ষে; **ন**—না; **চিরাৎ**—দীর্ঘকাল ধরে; **ঈশ-সঙ্গাৎ**—ভগবানের সঙ্গ প্রভাবে; **বিলীয়তে**—বিলীন হয়ে যায়।

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতির সংসর্গের ফলে জীবের এই বিপর্যয় বা স্বরূপ-বিস্মৃতি হয়, কিন্তু মনুষ্য-জীবন লাভ করার পর সে যদি ভগবান অথবা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করার শিক্ষা লাভ করে, তা হলে সে তার সেই পরিস্থিতিকে পরাভূত করতে পারে।

তাৎপর্য

প্রকৃতির অর্থ হচ্ছে জড় জগৎ এবং পুরুষ হচ্ছেন ভগবান। কেউ যদি প্রকৃতি বা শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তির সঙ্গ করে এবং মায়ার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মনে করে যে, সে প্রকৃতিকে ভোগ করতে পারে, তা হলে সে বদ্ধদশা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সে যদি তার চেতনার পরিবর্তন সাধন করে পরম পুরুষ (*পুরুষং শাশ্বতম্*) বা তাঁর পার্ষদদের সঙ্গ করে, তা হলে সে জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) বলা হয়েছে, *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ*—কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের রূপ, নাম, কার্যকলাপ এবং লীলা অনুসারে তত্ত্বত তাঁকে জানতে পারেন, তা হলে তিনি সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে থাকবেন। *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*—তা হলে তাঁর স্থূল শরীর ত্যাগ করার পর তাঁকে আর অন্য একটি স্থূল শরীর গ্রহণ করতে হবে না, পক্ষান্তরে তিনি চিন্ময় শরীর প্রাপ্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। এইভাবে জড়া প্রকৃতির সঙ্গজনিত দুঃখ-দুর্দশার সমাপ্তি হয়। মূল বক্তব্য হচ্ছে জীব ভগবানের নিত্য দাস, কিন্তু জড় জগতের সংস্পর্শে আসার ফলে এবং জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনার ফলে, সে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মুক্তির অর্থ হচ্ছে এই ভ্রান্ত মনোভাব পরিত্যাগ করে ভগবানের সেবা করার স্বাভাবিক বৃত্তি পুনর্জাগরিত করা। নিজের স্বরূপে ফিরে যাওয়ার নামই হচ্ছে মুক্তি, যে সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে—*মুক্তির্হিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ*।

শ্লোক ৫৬-৫৭

অয়ং হি শ্রুতসম্পন্নঃ শীলবৃত্তগুণালয়ঃ ।
ধৃতব্রতো মৃদুর্দান্তঃ সত্যবাঙ্মন্ত্রবিচ্ছুচিঃ ॥ ৫৬ ॥
গুর্বগ্ন্যতিথিবৃদ্ধানাং শুশ্রূষুরনহঙ্কৃতঃ ।
সর্বভূতসুহৃৎ সাধুর্মিতবাগনসূয়কঃ ॥ ৫৭ ॥

অয়ম্—এই ব্যক্তি (অজামিল নামক); **হি**—বস্তুত; **শ্রুত-সম্পন্নঃ**—বৈদিক জ্ঞানে উচ্চশিক্ষিত; **শীল**—সচ্চরিত্র; **বৃত্ত**—সৎ আচরণ; **গুণ**—এবং সদ্‌গুণাবলী; **আলয়ঃ**—আধার; **ধৃত-ব্রতঃ**—বৈদিক নির্দেশ পালনে দৃঢ়সংকল্প; **মৃদুঃ**—অত্যন্ত কোমল; **দান্তঃ**—মন এবং ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণরূপে সংযত করেছে; **সত্যবাক্**—সর্বদা সত্যবাদী; **মন্ত্র-বিৎ**—বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে পারদর্শী; **শুচিঃ**—অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; **গুরু**—শ্রীগুরুদেব; **অগ্নি**—অগ্নিদেব; **অতিথি**—অতিথি; **বৃদ্ধানাম্**—পরিবারের বৃদ্ধ গুরুজনদের; **শুশ্রূষুঃ**—অত্যন্ত শ্রদ্ধাপরায়ণ; **অনহঙ্কৃতঃ**—অহঙ্কারশূন্য; **সর্ব-ভূত-সুহৃৎ**—সমস্ত জীবের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন; **সাধুঃ**—সদ্ব্যবহার-সম্পন্ন (তাঁর চরিত্রে কেউ কোন দোষ খুঁজে পেত না); **মিত-বাক্**—অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে অর্থহীন বিষয়ে আলোচনা বর্জন করতেন; **অনসূয়কঃ**—ঈর্ষারহিত।

অনুবাদ

অজামিল নামক ব্রাহ্মণ প্রথমে বৈদিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, সৎ স্বভাব, সদাচার এবং সদ্‌গুণের আলয়, ব্রতনিষ্ঠ, কোমলচিত্ত এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। অধিকন্তু তিনি সত্যবাদী, মন্ত্রজ্ঞ এবং অত্যন্ত পবিত্র ছিলেন। অজামিল তাঁর শ্রীগুরুদেব, অগ্নিদেব, অতিথি ও বৃদ্ধদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি বস্তুতই নিরহঙ্কার, উন্নতচেতা, সর্বভূতের হিতকারী সুহৃৎ এবং সদাচরণ-সম্পন্ন ছিলেন। তিনি কখনও অনর্থক বাক্যালাপ করতেন না এবং কারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন না।

তাৎপর্য

যমদূতেরা পাপ এবং পুণ্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বোঝাচ্ছেন কিভাবে জীব জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অজামিলের ইতিহাস বর্ণনা করে যমদূতেরা বিশ্লেষণ করছেন কিভাবে প্রথমে তিনি বৈদিক শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন। তিনি সদাচার-সম্পন্ন, শুচি এবং সকলের প্রতি দয়ালু ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত সদ্‌গুণ তাঁর মধ্যে ছিল। অর্থাৎ তিনি ছিলেন একজন আদর্শ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ সর্বতোভাবে পুণ্যবান, তিনি সমস্ত বিধি-নিষেধ পালন করেন এবং তাঁর মধ্যে সমস্ত সদ্‌গুণ বিরাজ করে। পুণ্যের লক্ষণগুলি এই শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীল বীররাঘব আচার্য মন্তব্য করেছেন যে, *ধৃতব্রত* শব্দটির অর্থ হচ্ছে *ধৃতং ব্রতং স্ত্রীসঙ্গ রাহিত্যাত্মক-ব্রহ্মচর্যরূপম্*। অর্থাৎ, একজন আদর্শ ব্রহ্মচারীরূপে অজামিল ব্রহ্মচর্যের সমস্ত বিধি-নিষেধগুলি পালন করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন কোমল-হৃদয়,

সত্যবাদী, শুচি এবং পবিত্র। এই সমস্ত গুণাবলী সত্ত্বেও তিনি যে কিভাবে অধঃপতিত হয়েছিলেন এবং তার ফলে যমরাজের দ্বারা দণ্ডিত হতে যাচ্ছিলেন, সেই কথা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৫৮-৬০

একদাসৌ বনং যাতঃ পিতৃসন্দেশকৃদ্ দ্বিজঃ ।
আদায় তত আবৃত্তঃ ফলপুষ্পসমিৎকুশান্ ॥ ৫৮ ॥
দদর্শ কামিনং কঞ্চিচ্ছূদ্রং সহ ভুজিষ্যয়া ।
পীত্বা চ মধু মৈরেয়ং মদাঘূর্ণিতনেত্রয়া ॥ ৫৯ ॥
মত্তয়া বিশ্লথন্নীব্যা ব্যপেতং নিরপত্রপম্ ।
ক্রীড়ন্তমনুগায়ন্তং হসন্তমনয়ান্তিকে ॥ ৬০ ॥

একদা—এক সময়; **অসৌ**—সেই অজামিল; **বনম্ যাতঃ**—বনে গিয়েছিলেন; **পিতৃ**—তাঁর পিতার; **সন্দেশ**—আদেশ; **কৃৎ**—পালন করার জন্য; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **আদায়**—সংগ্রহ করে; **ততঃ**—বন থেকে; **আবৃত্তঃ**—ফেরার সময়; **ফল-পুষ্প**—ফল এবং ফুল; **সমিৎ-কুশান্**—সমিৎ এবং কুশ ঘাস; **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **কামিনম্**—অত্যন্ত কামার্ত; **কঞ্চিৎ**—কোন; **শূদ্রম্**—শূদ্র; **সহ**—সঙ্গে; **ভুজিষ্যয়া**—সাধারণ শূদ্রাণী বা বেশ্যা; **পীত্বা**—পান করে; **চ**—ও; **মধু**—সুরা; **মৈরেয়ম্**—সোম পুষ্প থেকে প্রস্তুত; **মদ**—উন্মত্ত হওয়ার ফলে; **আঘূর্ণিত**—ঘূর্ণিত; **নেত্রয়া**—তার চক্ষু; **মত্তয়া**—মদমত্ত হয়ে; **বিশ্লথৎ-নীব্যা**—যার বস্ত্র শিথিল হয়েছে; **ব্যপেতম্**—যথাযথ আচরণ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে; **নিরপত্রপম্**—লোকভয় পরিত্যাগ করে; **ক্রীড়ন্তম্**—আনন্দ উপভোগে মগ্ন হয়ে; **অনুগায়ন্তম্**—গান করে; **হসন্তম্**—হেসে; **অনয়া**—তার সঙ্গে; **অন্তিকে**—নিকটে।

অনুবাদ

সেই ব্রাহ্মণ অজামিল এক সময় তাঁর পিতার আদেশে ফল, ফুল, সমিৎ এবং কুশ ঘাস সংগ্রহ করার জন্য বনে গিয়েছিলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময়, তিনি পথে এক অত্যন্ত কামার্ত শূদ্রকে লজ্জা পরিত্যাগ করে এক বেশ্যাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করতে দেখেন। সেই শূদ্রটি তার আনন্দ প্রকাশ করে হাসছিল এবং গান গাইছিল যেন সেটিই হচ্ছে যথাযথ আচরণ। সেই শূদ্র এবং বেশ্যা

উভয়েই সুরাপানে উন্মত্ত ছিল। সুরাপানের ফলে সেই বেশ্যার চোখ ঘূর্ণিত হচ্ছিল এবং তার বসন শিথিল হয়েছিল। এই রকম অবস্থায় অজামিল তাদের দর্শন করেছিলেন।

তাৎপর্য

গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় পথে অজামিল এক শূদ্র ও বেশ্যাকে দেখতে পান, যাদের কথা এখানে অতি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পুরাকালেও মানুষকে কখনও কখনও সুরাপান করতে দেখা যেত, যদিও তা বহুল প্রচলিত ছিল না। কিন্তু কলিযুগে সর্বত্রই মানুষকে এই পাপকর্মটি করতে দেখা যায়, কারণ পৃথিবীর সর্বত্র মানুষেরা নির্লজ্জ হয়ে গেছে। দীর্ঘকাল পূর্বে আদর্শ ব্রহ্মচারী অজামিল মদ্যপানে উন্মত্ত শূদ্র এবং বেশ্যাকে দর্শন করে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। আজকাল এই দৃশ্য কত জায়গায় দেখা যায় এবং এই প্রকার আচরণ দর্শন করে ব্রহ্মচারীদের যে কি অবস্থা হয়, তা বিবেচনা করা কর্তব্য। নিষ্ঠা সহকারে বিধি-নিষেধগুলি পালন করার ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ়সংকল্প না হলে, ব্রহ্মচারীর পক্ষে স্থির থাকা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ যদি ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তা হলে পাপের দ্বারা সৃষ্ট প্রলোভনগুলি প্রতিরোধ করা যায়। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আসবপান, আমিষ আহার এবং দ্যূতক্রীড়া বর্জন করি। কলিযুগে একজন অর্ধনগ্ন রমণীকে নেশাচ্ছন্ন হয়ে একজন নেশাচ্ছন্ন পুরুষকে আলিঙ্গন করার দৃশ্য প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে, এবং সেই দৃশ্য দর্শন করার পর নিজেকে সংযত রাখা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় বিধি-নিষেধগুলি পালন করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই তাঁকে রক্ষা করবেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তাঁর ভক্তের কখনও বিনাশ হয় না (*কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*)। তাই কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনকারী সমস্ত শিষ্যদের কর্তব্য হচ্ছে নিষ্ঠাসহকারে বিধি-নিষেধগুলি পালন করা এবং ভগবানের দিব্য নাম ঐকান্তিকভাবে জপ করা। তা হলে আর ভয়ের কিছু থাকবে না। তা না হলে মানুষের পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, বিশেষ করে এই কলিযুগে।

শ্লোক ৬১

দৃষ্ট্বা তাং কামলিপ্তেন বাহুনা পরিরম্ভিতাম্ ।
জগাম হ্রচ্ছয়বশং সহসৈব বিমোহিতঃ ॥ ৬১ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **তাম্**—তাকে (সেই বেশ্যাকে); **কাম-লিপ্তেন**—কাম উদ্দীপনের জন্য হরিদ্রালিপ্ত; **বাহুনা**—বাহুর দ্বারা; **পরিরম্ভিতাম্**—আলিঙ্গিত; **জগাম**—গিয়েছিলেন; **হৃৎ-শয়**—হৃদয়ের কাম-বাসনার; **বশম্**—বশীভূত; **সহসা**—হঠাৎ; **এব**—বস্তুত; **বিমোহিতঃ**—মোহিত হয়ে।

অনুবাদ

শূদ্রটি হরিদ্রালিপ্ত বাহুর দ্বারা সেই বেশ্যাটিকে আলিঙ্গন করছিল। তা দেখে অজামিলের সুপ্ত কামবাসনা উদ্দীপ্ত হয়েছিল, এবং বিমোহিত হয়ে তিনি তখন কামের বশীভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, গায়ে হলুদ মাখলে বিপরীত যোনির কামভাব উদ্দীপ্ত হয়। *কামলিপ্তেন* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, সেই শূদ্রটির শরীর হরিদ্রায় অনুলিপ্ত ছিল।

শ্লোক ৬২

স্তম্ভয়ন্নাত্মনাত্মানং যাবৎসত্ত্বং যথাশ্রুতম্ ।
ন শশাক সমাধাতুং মনো মদনবেপিতম্ ॥ ৬২ ॥

স্তম্ভয়ন্—সংযত করার চেষ্টা করে; **আত্মনা**—বুদ্ধির দ্বারা; **আত্মানম্**—মনকে; **যাবৎ সত্ত্বম্**—যতদূর সম্ভব; **যথা-শ্রুতম্**—(ব্রহ্মচর্য, স্ত্রীদর্শন না করা ইত্যাদি) উপদেশ স্মরণ করে; **ন**—না; **শশাক**—সক্ষম ছিলেন; **সমাধাতুম্**—সংযত করতে; **মনঃ**—মন; **মদন-বেপিতম্**—কামবাসনা বা মদনের দ্বারা বিক্ষুব্ধ।

অনুবাদ

তিনি তখন স্ত্রীদর্শন পর্যন্ত না করার শাস্ত্রনির্দেশ যথাসাধ্য স্মরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। এই জ্ঞান এবং তাঁর বুদ্ধির দ্বারা তিনি নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু হৃদয়ে মদন বেগের প্রভাবে তিনি তাঁর মনকে সংযত করতে পারলেন না।

তাৎপর্য

শাস্ত্রজ্ঞান, ধৈর্য এবং দেহ, মন ও বুদ্ধির যথাযথ আচরণে অত্যন্ত শক্তিশালী না হলে, কামবাসনা সংযত করা অত্যন্ত কঠিন হয়। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে আমরা

দেখতে পাই যে, একজন পুরুষকে এক যুবতী রমণীর দেহ আলিঙ্গন করতে দেখলে এবং কামকলায় লিপ্ত হতে দেখলে, একজন পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্রাহ্মণের পক্ষেও তার কামবাসনা সংযত করা সম্ভব হয় না। যেহেতু কামের বেগ অত্যন্ত প্রবল, তাই ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের ফলে ভগবান কর্তৃক সুরক্ষিত না হলে ইন্দ্রিয় সংযম অসম্ভব।

শ্লোক ৬৩

তন্নিমিত্তস্মরব্যাজগ্রহগ্রস্তো বিচেতনঃ ।
তামেব মনসা ধ্যায়ন্ স্বধর্মাদ্বিররাম হ ॥ ৬৩ ॥

তৎ-নিমিত্ত—তাকে দেখার ফলে; **স্মর-ব্যাজ**—তার সম্বন্ধে সর্বদা চিন্তা করার ফলে; **গ্রহ-গ্রস্তঃ**—গ্রহ তাকে গ্রাস করেছিল; **বিচেতনঃ**—তার প্রকৃত স্থিতি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে; **তাম্**—তাকে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **মনসা**—মনের দ্বারা; **ধ্যায়ন্**—ধ্যান করে; **স্বধর্মাৎ**—ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম থেকে; **বিররাম হ**—তিনি সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

রাহু যেভাবে চন্দ্র এবং সূর্যকে গ্রাস করে, সেভাবেই সেই ব্রাহ্মণ অজামিল গ্রহগ্রস্ত হওয়ার ফলে তাঁর বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলেন। সর্বদা সেই বেশ্যার চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে অচিরেই তাঁর অধঃপতন হয়েছিল, এবং তিনি তাকে তাঁর গৃহে দাসীরূপে রেখেছিলেন এবং ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত আচার-আচরণ পরিত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পাঠকদের বোঝাতে চেয়েছেন যে, বেশ্যার সঙ্গ প্রভাবে অজামিল তাঁর ব্রাহ্মণত্ব থেকে এমনইভাবে অধঃপতিত হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত কার্যকলাপ বিস্মৃত হয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর জীবনের শেষ সময়ে, চার বর্ণ সমন্বিত নারায়ণের নাম উচ্চারণ করার ফলে, অধঃপতনের মহাভয় থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন। *স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*—ভগবদ্ভক্তির অতি অল্প অনুষ্ঠানের ফলেও মহাভয় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ভগবানের দিব্য নাম থেকে শুরু হয় যে ভগবদ্ভক্তি তা এতই শক্তিশালী যে, যৌন সঙ্গের ফলে ব্রাহ্মণের উচ্চপদ থেকে অধঃপতিত হলেও

ভগবানের দিব্য নাম যদি কোন না কোনভাবে কীর্তন করা যায়, তা হলে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এটিই ভগবানের নামের অস্বাভাবিক প্রভাব। তাই *ভগবদ্গীতায়* উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, ক্ষণিকের জন্যও মানুষ যেন ভগবানের নাম বিস্মৃত না হয় (*সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ*)। এই জড় জগৎ এতই বিপজ্জনক যে, যে কোন সময় অতি উচ্চপদ থেকে অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কেউ যদি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করার দ্বারা সর্বদা নিজেকে পবিত্র এবং দৃঢ়সংকল্প পরায়ণ রাখেন, তা হলে তিনি নিঃসন্দেহে সুরক্ষিত থাকবেন।

শ্লোক ৬৪

তামেব তোষয়ামাস পিত্র্যেণার্থেন যাবতা ।
গ্রাম্যৈর্মনোরমৈঃ কামৈঃ প্রসীদেত যথা তথা ॥ ৬৪ ॥

তাম্—তার (বেশ্যার); **এব**—বস্তুত; **তোষয়াম্ আস**—তাকে সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করেছিলেন; **পিত্র্যেণ**—পিতার; **অর্থেন**—অর্থের দ্বারা; **যাবতা**—যতদূর সম্ভব; **গ্রাম্যৈঃ**—জড়; **মনঃ-রমৈঃ**—মনের আনন্দদায়ক; **কামৈঃ**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের উপহারের দ্বারা; **প্রসীদেত**—যাতে সে সন্তুষ্ট থাকে; **যথা**—যাতে; **তথা**—সেইভাবে।

অনুবাদ

এইভাবে অজামিল সেই বেশ্যাকে নানা উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত অর্থ ব্যয় করতে থাকেন। সেই বেশ্যার সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য তিনি তাঁর সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত কার্যকলাপ পরিত্যাগ করেন।

তাৎপর্য

পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরও বেশ্যার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ফলে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত ধন-সম্পদ ব্যয় করার বহু দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সর্বত্র রয়েছে। বেশ্যাগমন এমনই একটি জঘন্য কার্য যে, তার ফলে চরিত্র তো নষ্ট হয়ই, সেই সঙ্গে মানুষ তার অতি উচ্চপদ থেকে অধঃপতিত হয় এবং তার সমস্ত ধন-সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়। তাই অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জন করা উচিত। মানুষের উচিত তার বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা, কারণ অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ সমস্ত সর্বনাশের মূল। কৃষ্ণভক্ত গৃহস্থের

কর্তব্য সর্বদা সেই কথা মনে রাখা। এক স্ত্রীকে নিয়েই তাঁর সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করা উচিত। তা না হলে তিনি যে কোন মুহূর্তে অজামিলের মতো অধঃপতিত হতে পারেন।

শ্লোক ৬৫

বিপ্রাং স্বভার্যামপ্রৌঢ়াং কুলে মহতি লম্ভিতাম্ ।
বিসসর্জাচিরাৎ পাপঃ স্বৈরিণ্যাপাঙ্গবিদ্ধধীঃ ॥ ৬৫ ॥

বিপ্রাম্—ব্রাহ্মণকন্যা; **স্ব-ভার্যাম্**—তাঁর পত্নী; **অপ্রৌঢ়াম্**—যুবতী; **কুলে**—পরিবার থেকে; **মহতি**—অত্যন্ত সম্মানিত; **লম্ভিতাম্**—বিবাহিত; **বিসসর্জ**—তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন; **অচিরাৎ**—অতি শীঘ্র; **পাপঃ**—পাপপূর্ণ হয়ে; **স্বৈরিণ্যা**—বেশ্যার; **অপাঙ্গ-বিদ্ধ-ধীঃ**—তাঁর বুদ্ধি কামপূর্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা বিদ্ধ হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

অজামিলের বুদ্ধি বেশ্যার কামপূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা বিদ্ধ হওয়ার ফলে, তিনি তাঁর অতি সুন্দরী নবযৌবনা, সৎ ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভবা পত্নীকে পরিত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর পিতার সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় এবং অজামিলও তাঁর পিতার সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সেই অর্থ দিয়ে তিনি কি করেছিলেন? শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সেই অর্থ ব্যয় করার পরিবর্তে তিনি একটি বেশ্যার সেবায় তা ব্যয় করেছিলেন। সেই মহাপাপের ফলে তিনি যমরাজের দণ্ডণীয় ছিলেন। কিভাবে তা হয়েছিল? তার কারণ তিনি এক বেশ্যার ভয়ঙ্কর কামপূর্ণ দৃষ্টিপাতের শিকার হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬৬

যতস্ততশ্চোপনিন্যে ন্যায়তোঽন্যায়তো ধনম্ ।
বভারাস্যাঃ কুটুম্বিন্যাঃ কুটুম্বং মন্দধীরয়ম্ ॥ ৬৬ ॥

যতঃ ততঃ—যেখানেই হোক এবং যেভাবেই হোক; **চ**—এবং; **উপনিন্যে**—তিনি উপার্জন করেছিলেন; **ন্যায়তঃ**—ন্যায্যভাবে; **অন্যায়তঃ**—অন্যায়ভাবে; **ধনম্**—ধন;

বভার—তিনি পালন করেছিলেন; **অস্যাঃ**—তাঁর; **কুটুম্বিন্যাঃ**—বহু পুত্র-কন্যা সমন্বিত; **কুটুম্বম্**—পরিবার; **মন্দধীঃ**—সর্বতোভাবে বুদ্ধিহীন; **অয়ম্**—এই ব্যক্তি (অজামিল)।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও, বেশ্যার সঙ্গ প্রভাবে তিনি তাঁর সমস্ত বুদ্ধি হারিয়ে এক দুর্বৃত্তে পরিণত হয়েছিলেন, এবং সেই বেশ্যার পুত্র-কন্যা সমন্বিত পরিবার প্রতিপালন করতে ধন উপার্জন করার জন্য ন্যায্য এবং অন্যায্য উপায় অবলম্বন করতেন।

শ্লোক ৬৭

যদসৌ শাস্ত্রমুল্লঙ্ঘ্য স্বৈরচার্যতিগর্হিতঃ ।
অবর্তত চিরং কালমঘায়ুরশুচির্মলাৎ ॥ ৬৭ ॥

যৎ—যেহেতু; **অসৌ**—এই ব্রাহ্মণ; **শাস্ত্রম্ উল্লঙ্ঘ্য**—শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে; **স্বৈরাচারী**—স্বেচ্ছাচারী; **অতি-গর্হিতঃ**—অত্যন্ত নিন্দিত; **অবর্তত**—অতিবাহিত করেছিলেন; **চিরম্ কালম্**—দীর্ঘকাল; **অঘায়ুঃ**—যাঁর জীবন পাপকর্মে পূর্ণ ছিল; **অশুচিঃ**—অপবিত্র; **মলাৎ**—পাপের ফলে।

অনুবাদ

এই ব্রাহ্মণ এইভাবে শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করে, যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়ে এবং বেশ্যার তৈরি ভোজন আহার করে দীর্ঘকাল যাপন করেছিলেন। তার ফলে তাঁর জীবন অত্যন্ত পাপময় হয়েছিল এবং তিনি অপবিত্র ও অন্যায় কর্মে আসক্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

অপবিত্র এবং পাপপূর্ণ পুরুষ অথবা স্ত্রীর, বিশেষ করে বেশ্যার রান্না করা খাবার অত্যন্ত সংক্রামক। অজামিল সেই অন্ন আহার করেছিলেন এবং তার ফলে সে যমরাজের দণ্ডণীয় হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬৮

তত এনং দণ্ডপাণেঃ সকাশং কৃতকিল্বিষম্ ।
নেষ্যামোঽকৃতনির্বেশং যত্র দণ্ডেন শুদ্ধ্যতি ॥ ৬৮ ॥

ততঃ—অতএব; **এনম্**—তাঁকে; **দণ্ড-পাণেঃ**—যমরাজের, যার দণ্ডদান অধিকার রয়েছে; **সকাশম্**—উপস্থিতিতে; **কৃত-কিল্বিষম্**—যিনি সব সময় সর্বপ্রকার পাপকর্মে লিপ্ত হয়েছেন; **নেষ্যামঃ**—আমরা নিয়ে যাব; **অকৃত-নির্বেশম্**—যিনি কোন প্রায়শ্চিত্ত করেননি; **যত্র**—যেখানে; **দণ্ডেন**—দণ্ডের দ্বারা; **শুদ্ধ্যতি**—যিনি শুদ্ধ হবেন।

অনুবাদ

এই অজামিল কোন প্রায়শ্চিত্ত করেননি। অতএব আমরা তাঁকে তাঁর পাপ কর্মের দণ্ডভোগের জন্য যমরাজের কাছে নিয়ে যাব। সেখানে তাঁর পাপকর্ম অনুসারে দণ্ডভোগ করে তিনি শুদ্ধ হবেন।

তাৎপর্য

যমদূতদের অজামিলকে নিয়ে যেতে বিষ্ণুদূতেরা নিষেধ করেছিলেন, এবং তাই যমদূতেরা বোঝাচ্ছিলেন কেন এই ধরনের পাপীকে যমরাজের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। অজামিল যেহেতু তাঁর পাপকর্মের জন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত করেননি, তাই তাঁকে শুদ্ধ করার জন্য যমরাজের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কেউ যখন কাউকে হত্যা করে, তখন তার সেই পাপের জন্য তাকেও বধ করা উচিত; তা না হলে তার সেই পাপের জন্য তাকে তার মৃত্যুর পর নানা প্রকার ভয়ঙ্কর ফল ভোগ করতে হবে। তেমনই, যমরাজের দেওয়া দণ্ড হচ্ছে পাপীদের পবিত্র করার উপায়। তাই যমদূতেরা বিষ্ণুদূতদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন তাঁরা যেন অজামিলকে যমরাজের কাছে নিয়ে যেতে তাঁদের বাধা না দেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'অজামিলের উপাখ্যান' নামক প্রথম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।